সমাজ সংগঠন ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

www.nagorikpathagar.org

লেখক পরিচিতি

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ নোয়াখালী জেলার হাতিয়ায় ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৩ সালে হাতিয়া রহমানিয়া মাদ্রাসা থেকে দাখিল, ১৯৮৫ সালে ওছখালী হাদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে আলিম (মেধা তালিকায় ১৩তম স্থান), নোয়াখালী কারামতিয়া আলীয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৮৭ ও ১৯৮৯ সালে যথাক্রমে ফাজিল ও কামিল শ্রেণীতে কৃতিত্বের সাথে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৯৩ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ' বিভাগে বি.এ. (অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় এবং ১৯৯৫ সালে এম.এ-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি বর্তমানে "সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর তাফসীর ফি জিলালিল কুরআন ঃ প্রাচীন ও আধুনিক তাফসীর সমূহের তুলনামূলক আলোচনা" বিষয়ের উপর এম.ফিল গবেষণারত। কৈশোর থেকেই ছড়া, কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর লেখালেখি শুরু। জাতীয় ও স্থানীয় পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে ইতোমধ্যে তার শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লিখিত সাইয়েদ কুতুব : জীবন ও কর্ম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, বর্ণমালায় ছড়া শিক্ষাসহ আরও কয়েকটি বই প্রকাশের পথে।

www.nagorikpathagar.org

সমাজ সংগঠন ঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী

আব্দুদদাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

মুক্তমন প্রকাশন
পুরানা পল্টন, ঢাকা

পরিবেশনায়
প্রফেসর'স বুক কর্নার
১৯১, ওয়ারলেছ রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৯৩৪১৯১৫

www.nagorikpathagar.org

সমাজ সংগঠন ঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর '৯৮ ইং

প্রকাশিকা

রোজী সাজেদা মুন্নী

মুক্তমন প্রকাশন

ফোন ঃ ৯০০৪৫০৬

গ্রন্থ স্বত্ব

[প্রকাশিকা কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত]

সার্বিক সহযোগিতা

মুহাম্মদ ইবরাহীম বাহারী

বর্ণ বিন্যাস

প্রফেসর'স কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র।

Samaj Sangathan ঃ Islami Drishtivongi

by Abdud Dayyan Mohammad Younus

Published by **Rosy Sajeda (Munnie)**

Edited by **Shah Abdul Hannan**

First Edition December 1998

Copy Right Rosy Sajeda Munnie

Price Tk. 50.00 Only. $ 5

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাভাজন পিতা
মৌলভী মুজাফফর আহমদ
মমতাময়ী মাতা
মরহুমা মজিবা খাতুন
বড় ভাই
মাওঃ আবুল খায়ের
মাওঃ ছোলাইমান ও
মাওঃ ইদ্রিছ সহ
যাদের স্নেহ পরশে বড় হয়েছি
ও ইলমে দ্বীন শিক্ষার সুযোগ পেয়েছি।

www.nagorikpathagar.org

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব শাহ্ আব্দুল হান্নান-এর অভিমত

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ বেশ কিছুদিন থেকে প্রবন্ধ লিখে আসছেন। তিনি একজন পরিশ্রমী লেখক। অনেক বিষয়ে তিনি লিখেছেন। তার প্রবন্ধ সমূহের সংকলন হিসেবে প্রথম গ্রন্থ "সমাজ সংগঠন : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী" প্রকাশ করা হলো।

এ যুগ হচ্ছে জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগে যেসব দেশ নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে সবার চেয়ে অগ্রসর। সে সব দেশে সামাজিক সমস্যা ব্যাপক এবং নৈতিকতা মারাত্মক.বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হওয়া এবং উচ্চতর প্রশাসনিক ব্যবস্থা (System) গড়ে তুলার কারণে বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমাদের জন্য পাশ্চাত্যের মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক (intellectual)। তারা প্রশ্ন তুলছে যে ইসলামে মানবাধিকার নাই। নারীর অধিকার বিপন্ন, সেক্যুলার ব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এসব অসংখ্য প্রশ্নের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং একাডেমিক জওয়াব দিতে হবে। মুসলিম বিশ্বের সামনে অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে অসংখ্য যোগ্য লোক বিশেষ করে Intellectual তৈরী করা। আমাদের অধিক পড়াশুনা (Study), অধিক লিখা (write) ও অধিক দাওয়াতের কাজ করতে হবে।

মুহাম্মদ ইউনুছের বই আমি সাধ্যমত দেখে দিয়েছি। তার কোনো কোনো মতামত থেকে কেউ ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। এটা স্বাভাবিক। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা হয়েই থাকে। যে কেউ তার ভুলভ্রান্তি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সামগ্রিক দলিলের ভিত্তিতে দেখিয়ে দিলে তিনি তা সংশোধন করবেন বলে আশা করি।

আমি তার লেখক জীবনের উন্নতি এবং এ বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করি।

শাহ্ আব্দুল হান্নান

০৯-১২-৯৮ইং

www.nagorikpathagar.org

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, যাঁর একান্ত মেহেরবাণীতে "সমাজ সংগঠনঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী" নামক বইটি প্রকাশিত হয়েছে। মূলতঃ এ বইটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রিকায় আমার প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ থেকে নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন। দীর্ঘদিন থেকে শ্রদ্ধাষ্পদ মুহাম্মদ কামারুজ্জমান ভাই, সম্পাদক, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, শ্রদ্ধাভাজন কবি মতিউর রহমান মল্লিক ভাইসহ অনেকেই বই প্রকাশের জন্য পরামর্শ দিয়ে আসছেন। নানাবিধ সমস্যার কারণে এতদিন প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। যাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ও পরামর্শে বইটি প্রকাশিত হল অমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। ১৯৮৫ সাল থেকেই বিভিন্ন সময়ে এ লেখাগুলো লেখা হয় ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমার সেসব লেখা দেখে দেওয়ার জন্য শ্রদ্ধাভাজন শাহ আব্দুল হান্নান, সাবেক সচিব ও চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, তাঁর যে মূল্যবান সময় দিয়েছেন আমি চিরদিন তার কাছে ঋনী থাকব। তিনি অনেক ব্যাস্ততার মাঝেও সম্পূর্ণ পান্ডুলিপি পড়েছেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করেছেন। তাঁর দিক নির্দেশানুসারে আমি বইটি সাজিয়েছি। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। ইবনে সীনা ফার্ম্যাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিঃ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রদ্ধাষ্পদ জনাব আবু নাসের মুহাম্মদ আব্দুজ জাহের লেখালেখির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় যে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর আ. ন. ম আব্দুল মান্নান খান ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যায়য়ের আলকুরআন এন্ড ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব আ, ব, ম হিজবুল্যাহ পান্ডুলিপি তৈরীতে দিক নির্দেশনা দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। এই বইয়ের প্রবন্ধ লেখার সময় বর্তমান বিশ্বের যেসব ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও পণ্ডিতগণের লেখা থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে আমি তাদের কাছেও ঋনী। বইয়ে নামকরন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে কবি সোলায়মান আহসান, জনাব, আলাউদ্দিন ভাই, বন্ধুবর শাহআলম ভুইয়া, কামাল আহমদ শিকদার, মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, আহসান হাবীব ইমরোজ, সিরাজুল ইসলাম শাহীন, মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, সুপ্রিয় ইবরাহীম বাহারী, মুহাম্মদ মহসীন, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মুহাম্মদ মিজানুল হক মামুন, প্রফেসর'স বুক কর্ণারের সত্বাধিকারী জনাব আমিনুল ইসলাম সহ অনেকেই আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বইয়ে যে কোন ধরনের ভুল ভ্রান্তি শ্রদ্ধেয় পাঠকদের নজরে আসলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করি এবং যে কোন ধরনের সংশোধনী ও পরামর্শ জানালে তা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা হবে। আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন ইসলামী আদর্শের আলোকে গঠনের ক্ষেত্রে বইটি সামান্যতম সাহায্য করলেও শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে আমরন চলার তৈফিক দিন। আমীন।

আব্দুদদাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ
০১-১২-৯৮ ইং

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

- মহানবীর আদর্শ ও আজকের সমাজ ৭
- অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে প্রচলিত আইন ও মহানবীর আদর্শ ১৭
- আল কুরআন ঐশীগ্রন্থ হওয়ার প্রমাণ ও কতিপয় সংশয় নিরসন ২৪
- ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন ঃ বর্তমান প্রেক্ষিত ৩৩
- ধর্ম অবমাননা ঃ প্রচলিত ও ইসলামী আইন ৩৮
- অর্থবহ নাম রাখুন- সুন্দর নামে ডাকুন ৪২
- শাফায়াত ৪৫
- কুরবানীর তাৎপর্য ও শিক্ষা ৫০
- মহররমের শিক্ষা ঃ বর্তমান প্রেক্ষিত ৫৭
- হজ্বের গুরুত্ব ও শিক্ষা ৬১
- মাহে রমজানের ফজিলত ও গুরুত্ব ৬৮
- রোজার তাৎপর্য ও শিক্ষা ৭০
- ভোট ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ ৭৩
- ইখতেলাফ ৭৫
- একাধিক ইসলামী দল ও ইসলামী ঐক্য ৮৩
- বাইয়াত ৯১
- পরিকল্পিত ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ১০৩

www.nagorikpathagar.org

মহানবীর আদর্শ ও আজকের সমাজ

তামাম দুনিয়াতে অশান্তি। পরিবারে অশান্তি, সমাজে অশান্তি, দেশে অশান্তি, সর্বত্রই অশান্তি। পরিবারে স্বামী-স্ত্রীতে কলহ, এসিড নিক্ষেপ, একে অপরকে হত্যা, যৌতুক লোভী স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নির্মম নির্যাতন, পরকীয়া প্রেমে পরের স্ত্রীকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার ঘটনা অহরহ সংঘটিত হচ্ছে। ডাক্তার কর্তৃক রোগিনী ধর্ষণ, শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী উধাও, চাঁদাবাজদের দৌরাত্মে ব্যবসায়ী খুন, পুলিশ হেফাজতে আসামী খুন, ধর্ষণের মত ঘটনা ঘটছে, মাত্র ২০ টাকা কিংবা একটি সিগারেটের কারণে খুন হচ্ছে মানুষ। না খেয়ে মারা যাচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত-বনী আদম, ক্ষুধার জ্বালায় যে মুহূর্তে ৫০ টাকায় সন্তান বিক্রী করে কিংবা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার ঘটনা ঘটছে, সে মুহূর্তে দায়িত্বহীনতায় অপচয় হচ্ছে কোটি কোটি টাকার জাতীয় সম্পদ। খুনের মামলার দাগী আসামী প্রকাশ্যে ঘুরছে অথচ বিনা বিচারে ২২ বছর জেলখানায় আটক থাকার খবর পত্রিকায় বেরুচ্ছে। কোথায় মানবাধিকার? প্রভাবশালীরা আইনের ফাঁকফোঁকরে রেহাই পাচ্ছে। আর পাঁচ বছরের অবুঝ শিশুকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জামিন নিতে হচ্ছে। কোথায় আইনের শাসন?

পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলো পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। অকালে ঝরে যাচ্ছে অবুঝ শিশুর প্রাণ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার জীবন প্রদীপ। বসনিয়া, চেচনিয়া, কাশ্মীর সর্বত্রই অশান্তির দাবালন জ্বলছে। সর্বত্রই একই আওয়াজ, 'শান্তি চাই, মুক্তি চাই, বাঁচতে চাই, বাঁচার অধিকার চাই।' জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ শান্তি, স্থিতি, মানবাধিকার রক্ষায় ব্যর্থ। সভ্যতার নামে অসভ্যতা, প্রগতির নামে দূর্গতি, শান্তির নামে অশান্তি, নিয়মের নামে অনিয়ম, কল্যাণের নামে অকল্যাণ, মানবতার সেবার নামে মনুষত্ব বিবর্জিত কার্যকলাপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

আইয়ামে জাহেলিয়ার অনেক কথা শুনেছি। কিন্তু পিতা কর্তৃক কন্যা ধর্ষণের ঘটনা কি জাহেলিয়া যুগে ঘটেছিল? মা-বাবাকে সামান্য কারণে প্রহারের, হত্যার ঘটনা কি এত বেশী ছিল? সে সময়ও মানুষ খুন হত, কিন্তু বস্তাবন্দী করে কি জীবন্ত মানুষকে জ্বলন্ত আগুনে হত্যা করা হত? সে সময়ও যুদ্ধ হত, কিন্তু এটম বোমা নিক্ষেপ করে কি মানব বসতি, সভ্যতার বুনিয়াদ এভাবে ধ্বংস করা হত? তাহলে আমরা কোথায় বসবাস করছি? আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হয়েছি, নতুন নতুন গ্রহ-উপগ্রহ আবিষ্কার করছি। আমরা Computer আবিষ্কার করেছি, ব্যবহার করছি। এত কিছু আবিষ্কারের পরও শান্তির পথ আবিস্কার করতে পারিনি। তাইত বিল ক্লিনটনের ব্যক্তি জীবনে কেলেংকারী ও ডায়না প্রিন্সের পারিবারিক জীবনে অশান্তির ঘটনা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে।

কিন্তু আরবের অসভ্য জাতিকে কিভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) সুসভ্য জাতিতে পরিণত করেছিলেন, মাত্র ২৩ বছরের ব্যবধানে? অনৈতিকতায় অভ্যস্ত একটি জাতিকে নৈতিক চেতনায় উজ্জীবিত করে সোনার মানুষে পরিণত করেছেন। দৈনিক খুন-খারাবী ছিল যাদের নিত্য দিনের কর্মসূচী, তারা মৃত্যুর সময় পানির পেয়ালা অপর

www.nagorikpathagar.org

ভাইয়ের কাছে পাঠাবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন কি করে? নারী ধর্ষণ ছিল যাদের নেশা সে সমাজে আরব থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত একজন সুন্দরী রমণী কিভাবে একাকী ভ্রমণের নিরাপত্তা লাভ করল? চুরি, ডাকাতি ছিল যাদের নিত্যদিনের রুটিন, সে সমাজে রাতে ঘরের দরজা খুলে ঘুমাবার পরিবেশ এল কিভাবে? শাসক রাতের আঁধারে প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা দেখার জন্য ঘুরছেন, আর বলছেন, "ফোরাতের তীরে একটি কুকুর অভুক্ত মারা গেলে আমাকে জবাবদিহী করতে হবে।" এ অনুভূতি সৃষ্টির পিছনে কার অবদান? ইতিহাস সাক্ষী, অসভ্য আরব জাতি সুসভ্য হয়েছে মহানবীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, জীবন যাপন করে।

আজকের বিশ্বেও যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে মহানবীর আদর্শের বিকল্প নেই। পন্ডিত জর্জ বার্নাডশ যথাযর্থই বলেছেন, I believe that if a man like Mohammad were to assume the dictatorship of modern world. He would succeed is solving its problems in a way that would, bring it, much needed peace and hapiness" নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত আজকের যুগে রাসূল (সাঃ) এর আদর্শই বাস্তব সমাধান দিতে পারে। এ কথাটি জর্জ বার্ণাডশ'র কথায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে– A time surely will come, sooner or later when the world will be tarced to admit that the only means to end all its troubles is to follow the perfect teaching and example of the Holy prophet (sm).

মূলতঃ কোন বস্তুর পরিমাপ তখন ঠিক হয় যখন যার ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয় তা নিখুঁত ও সঠিক হয়। যেমনঃ একজন দরজি কাপড় সেলাইয়ের সময় পেনসিল দিয়ে দাগ কাটে, পেন্সিলের দাগ কাটা নিখুঁত হলে সেলাই সুন্দর হবে আর তা আঁকা বাঁকা হলে জামা অসুন্দর হবে। তেমনি একজন মানুষ বা একটি দেশ যা অনুসরণ করবে বা যার ভিত্তিতে চলবে তা যদি নিখুঁত না হয় তাহলে সে ব্যক্তির জীবন বা দেশ নিখুঁতভাবে চলতে পারেনা। আর প্রত্যেক মানুষই চলার ক্ষেত্রে কাউকে না কাউকে অনুসরণ করে। যেমন হাতের লেখা সুন্দর করার জন্যে 'আদর্শ লিপি' এর অনুসরণ করা হয়। তেমনি ব্যক্তি জীবন ও দেশ পরিচালনার জন্য 'আদর্শ মানুষ' এর অনুসরণ প্রয়োজন। পৃথিবীতে অনেক তাত্ত্বিক আবির্ভূত হয়েছেন যাঁরা তত্ত্ব উপহার দিয়েছেন কিন্তু বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেননি। কিংবা নিজে যে তত্ত্ব দিয়েছেন তা অপরের অনুসরণের জন্য কিন্তু নিজে তা জীবনে প্রতিফলিত করে দেখাতে পারেননি। এমন কাউকে কি পাওয়া যাবে যিনি শিশুকালে দুধ পানের সময়, বাল্যকালে খেলার মাঠে, যুবক বয়সে নানাকর্মে, সেনাপতি, রাষ্ট্রপতি, বিচারপতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় কাজে, স্বামী হিসেবে স্ত্রীর সাথে স্বজনদের সাথে আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন? এমন মানুষ একজনই আছেন, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ (সাঃ)। যিনি নখকাটা, পেশাব-পায়খানা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আদর্শ। যিনি কোন অঞ্চলের কোন নির্দিষ্ট ভাষা-ভাষীর কোন নির্দিষ্ট কালের জন্য আবির্ভূত হননি। যিনি আবির্ভূত হন, 'সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য

www.nagorikpathagar.org

রহমতস্বরূপ।' সাদা-কালো, আরব-অনারবের ভেদাভেদ দূর করে তিনি হয়েছেন ন্যায় ইনসাফের প্রতীক। যার কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে মানবতার জয়গান। 'তোমাদের পরস্পরের জন্য পরস্পরের রক্ত হারাম, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, রক্তপাত, যুদ্ধ:দেহী মনোভাব অবসানে যিনি ঘোষণা করেছেন,' যিনি নারীকে মাতৃত্বের মর্যাদা দিয়ে ঘোষণা করেছেন, 'আল্ জান্নাতু তাহ্তা আক্দামিল উম্মাহাত।' মায়ের পদ তলে সন্তানের বেহেশত। যিনি শতধাবিভক্ত আরব সমাজে কায়েম করেছেন, 'বুনিয়ানুম্ মারসুসের' মত ভ্রাতৃত্বের সুমধুর বন্ধন। মুহাজিরদেরকে আনসারদের জায়গা জমি দান তারই নজীর। যিনি ছিলেন সমাজ দরদী বাল্যকালে 'হিল্ফুল ফুজুল' গঠন তারই প্রমান। যাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্তে 'হাজরে আসওয়াদ' যথাস্থানে সংস্থাপনে রক্তক্ষয়ী সংঘাত এড়ানো সম্ভব হয়েছ। যাঁর আমনতদারীতায় মুগ্ধ হয়ে শত্রুরাও টাকা পয়সা অর্থকড়ি আমানত রাখত, যার প্রেক্ষিতে আল আমিন উপাধি পেয়েছিলেন।

যার চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে, নামাজরত অবস্থায় নাড়ি ভূড়ি গর্দানে দিয়ে, শেয়াবে আবু তালিবে বন্দী করে, তায়েফে পাথরাঘাতে জর্জরিত করে, অবশেষে হত্যার ষড়যন্ত্র করে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। তিনিই হচ্ছেন মানবেতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান ব্যক্তিত্ব, মহান আদর্শ, মহান পুরুষ। তিনি আপন চারিত্রিক মাধুর্যতা দিয়ে যে বিপ্লব করেছিলেন আজকের সমাজে সে ধরনের বিপ্লব প্রয়োজন। আজকের যুগে তাঁর মত ব্যক্তি পাওয়া যাবেনা। কিন্তু তাঁর উপস্থাপিত আদর্শ অনুসরণ করার মাধ্যমেই আজকের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

বাংলাদেশের উপজাতীয় অধিবাসী চাকমা, খাসিয়া, সাঁওতাল, গারো ইত্যাদি থেকে শুরু করে আফ্রিকার আদিম অসভ্য ও উলঙ্গ এ্যাবোরেজিন্সের জন্যও তাঁর আদর্শ উপযোগী। সংকল্পে দৃঢ়তা, সাধনায় অদম্যতা, সাহসিকতা, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতাবোধ, আল্লাহ নির্ভরশীলতা, অল্পে তুষ্টি, ত্যাগ-তিতিক্ষা, বিনয়, বদান্যতা, ধর্মভীরুতা, মানবতাবোধ, মানব চরিত্রের ইত্যাকার প্রতিটি গুনে তিনি ছিলেন বিভুষিত। তাইত পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ পপ গায়ক তাঁর আদর্শের মধ্যেই তৃপ্তির সন্ধান পেলেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ট মুক্তিযোদ্ধা পেলেন মুক্তির ঠিকানা, ভারতের এক সময়কার অর্ধশত কোটি মানুষের ভগবান পেলেন মুক্তির আশ্রয়। তাঁর আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিলেন হিট্টি, গীবন, ঈশ্বরী প্রসাদ, মাইকেল এইচ হার্ট, ডঃ মরীসবুকাইলি সহ আরও অনেকে। আলফ্রেড দে নামাহিন তাঁর তুর্কী ইতিহাসের প্রথম খন্ডে বলেছেন, 'দার্শনিক, বক্তা, ধর্মপ্রচারক, যোদ্ধা, আইন রচয়িতা, ভাবের বিজয়কর্তা, ধর্ম মতের ও প্রতিমাবিহীন ধর্ম পদ্ধতির সংস্থাপক কুড়িটি পার্থিব রাজ্যের এবং একটি ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দেখ সেই মুহাম্মদ (সাঃ)-কে। মানুষের মহত্ত্বের যতগুলি মাপকাঠি আছে তা দিয়ে মাপলে কোন লোক তার চেয়ে মহৎ হতে পারে?' পিতা হিসেবে, ভাই হিসেবে, সন্তান হিসেবে, প্রতিবেশী হিসেবে, সৈনিক হিসেবে, যোদ্ধা হিসেবে, সেনাপতি হিসেবে, নাগরিক হিসেবে, বিচারক হিসেবে, রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে, ক্রেতা হিসেবে, বিক্রেতা হিসেবে, রাজনীতিবিদ হিসেবে, কূটনীতিক হিসেবে তিনিই হচ্ছেন 'উসওয়ায়ে হাসানা' বা সর্বোত্তম আদর্শ। যাঁর

www.nagorikpathagar.org

চরিত্র হচ্ছে বাস্তব কুরআন। শিশু বয়স থেকে ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি দিকই তাঁর অনুপম অদর্শ।

অণুপম চরিত্রের আধাঁরঃ রাসুলে আকরাম (সঃ)

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমাদের জন্য রাসুলের জীবনে রয়েছে এক উত্তম আদর্শ।' আজকের সমাজে সে আদর্শ অনুসরণে সোনালী পৃথিবী গড়া সম্ভব। নিম্নে কতিপয় উদাহরণ তুলে ধরা হলোঃ

১. আল্লাহ ভীরুতাঃ এক রাত। রাসূল (সাঃ) স্বীয় বিছানায় একটি খেজুর পেয়ে খেয়ে ফেললেন। পরক্ষণে মনে হল সদকার খেজুর খেলেন কিনা? (যাবতীয় সদকা নবী (সাঃ) এর জন্য হারাম ছিল) এ চিন্তায় সারা রাত ঘুমোতে পারেননি। অথচ আজকে আমরা কত কিছু খাই, আদৌ কি ভাবি যা খাচ্ছি তা বৈধ কিনা?

২. অমায়িকতাঃ নবী (সাঃ) গাধার পিঠেও সওয়ার হতেন, নিজ হাতে ছাগলের দুধ দোহন করতেন, বাজারে যেতেন, ক্রীত দাসদের দাওয়াত সানন্দে গ্রহণ করতেন, গরীবদের সাথে উঠাবসা করতেন। মক্কা বিজয়ী বীর নম্রতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মস্তকাবনত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। অথচ তিনি ছিলেন দু'জাহানের নেতা, সাইয়েদুল মুরসালীন। অথচ আজকের সমাজে একটি বড় পদে অধিষ্ঠিত হলেই দর্পভরে চলাচল করতে অনেককে দেখা যায়।

৩. আল্লাহর কৃতজ্ঞতাঃ রাসূল (সাঃ) রাতে এত বেশী ইবাদত করতেন তাঁর পা মুবারক ফুলে যেত। সাহাবগণ প্রশ্ন করতেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিতো নিষ্পাপ। এত কষ্ট করেন কেন? তিনি জবাবে বলেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হবো না।

৪. দ্বীনের পথে দৃঢ়তাঃ রাসূল (সাঃ) দ্বীনের হকের দাওয়াত দিতে গিয়ে তায়েফে স্বীয় রক্তে রঞ্জিত হলেন, পথে কাঁটা বিছিয়ে দেয়া হত, পাগল, যাদুকর, গণক, কবি, ফাসাদ সৃষ্টিকারী প্রভৃতি আখ্যায়িত করা হত। নামাজরত অবস্থায় উটের নাড়িভুড়ি গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হত, হত্যার ষড়যন্ত্র হল, ওহুদে দাঁত শহীদ হল। তবু সর্বাবস্থায় দ্বীনের পথে অটল ছিলেন।

৫. সাহসিকতাঃ হুনায়ন যুদ্ধে যখন মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা, জনা কয়েক সাহাবা তাঁর পার্শ্বে, সে মুহূর্তে "আনা নাবিয়্যুন লা কাযিবা আনা ইবনু আবদিল মুত্তালিব" তেজোদীপ্ত এই কবিতা শুনিয়ে সকলকে সাহস যুগিয়েছেন। ওহুদ যুদ্ধে বর্শার মুখেও সকলকে সংগঠিত করেছেন।

৬. ন্যায় ইনসাফঃ একবার এক বড় বংশের একজন চুরি করল। নির্দেশ দেয়া হল তার হাত কাটতে। সাহাবাদের কেউ কেউ বিষয়টি হালকা করতে চাইলেন। নবীজীর (সাঃ) চেহারা রাগে রক্তিম হয়ে উঠল। আর ঘোষণা করলেন, 'নবী নন্দিনী ফাতেমাও যদি চুরি করত আমি নির্ঘাত তার হাত কেটে ফেলতাম।' আজকের সমাজে প্রভাবশালীরা অপরাধ করে রেহাই পায়। অথচ নির্দোষ ব্যক্তি সাজা পায়। এ ধরনের রিপোর্ট পত্রিকায় হরহামেশা ছাপা হচ্ছে।

৭. বিনয়ঃ একবার তাঁর দুধ মা হালিমা আসলেন, জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধা। নবীজী সবিনয়ে দাঁড়ালেন। নিজের মাথার পবিত্র পাগড়ী বিছিয়ে দিলেন। সবাইকে বললেন

www.nagorikpathagar.org

জানো ইনি আমার মা। তাঁর বিনয় ছিল এমন কারো সাথে সাক্ষাত হলে আগে সালাম দিতেন, মুসাফাহা করতেন, আগে হাত টেনে নিতেন না।

৮. সহনশীলতাঃ এক ইহুদীর রাসূল (সাঃ) এর কাছে কিছু পাওনা ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের আগে এসেই নবীজীর গায়ে জড়ানো চাদর টেনে ধরল, গালমন্দও করল। হযরত ওমর চোখ লাল করে ইহুদীর দিকে তাকিয়ে বলল, অনুমতি দিন গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূল (সাঃ) ওমরকে থামালেন। ওমরের রাগের জন্য ধমক দিলেন। এ কারণে পাওনার চেয়ে অতিরিক্ত ২০ সা খেজুর বেশী দিতে বললেন।

৯. ক্ষমাঃ তায়েফের ময়দানে চারিদিক থেকে পাথর বৃষ্টির মত পড়ছে। নবীজীর গা বেয়ে রক্ত ঝরছে। রক্তে তার জুতো ভরে গেছে। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। জিবরীল আমিন অনুমতি চাইলেন তাদের পিষে ফেলার জন্য। রাসূল (সাঃ) তাদের ক্ষমা করলেন। ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ ওদের ক্ষমা করে দাও, ওরা বুঝেনি।

১০. হাস্য কৌতুকঃ অনাবিল আনন্দের জন্য হাস্য রসিকতা করতেন। একবার আলী (রাঃ) মাটিতে শোয়া। রাসূল (সাঃ) তাই আখ্যায়িত করলেন 'আবু তোরাব।' হযরত আব্দুর রহমান বিড়ালের বাচ্চা আস্তিনে করে আনলে অভিহিত করেন, আবু হুরায়রা। এক বৃদ্ধা এসে দোয়া চাইলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি যেন জান্নাতবাসী হই। তিনি জবাব দিলেন. বুড়ীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' বৃদ্ধা কান্না জুড়ে দিল। এ অবস্থা দেখে বললেন, আল্লাহ সবাইকে পূর্ণ যৌবন দান করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। একদিন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মামার বোন তোমার কি হয়?' লোকটি ভাবতে শুরু করল। মুচকি হেসে রাসূল বললেন, 'আশ্চর্য তুমি তোমার মাকেই ভুলে গেলে?'

১১. আদর্শের প্রতি আপোষহীনঃ কুরাইশ সর্দাররা প্রিয় নবীকে দাওয়াতের কাজ থেকে রিবত রাখার জন্য প্রস্তাব দিল 'যদি তুমি সুন্দরী রমণী চাও, তা দেব। যদি বাদশাহী চাও, তাও দেব। যদি অঢেল সম্পদ চাও, তাহলে সম্পত্তির মালিক বানাব।' নবী (সাঃ) জবাব দিলেন, আমার একহাতে চাঁদ আরেক হাতে সূর্য এনে দিলেও আমি দ্বীনের দাওয়াত থেকে বিরত হব না। যতক্ষন না আল্লাহ দ্বীন গালেব না হয়।

পারিবারিক জীবনে রাসূলের আদর্শ

পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি কমই আছে যার Public life and personal life এ সঙ্গতি বিদ্যমান। রাসূল (সাঃ) এর দাম্পত্য জীবন অনুসরণীয় এক আদর্শ। পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছর বয়সী বিধবা খাদীজাকে বিয়ে করেন। অধিকাংশ স্ত্রী ছিল বিধবা এবং পৌঢ়া। তিনি সকল স্ত্রীর প্রতি সমান ইনসাফ করতেন। তাঁদের অধিকারের প্রতি ছিলেন সচেতন। অনেক সময় সকল স্ত্রীকে এক সাথে বসিয়ে আলাপ আলোচনা ও রসাত্মক কথা বার্তা বলতেন। হযরত আয়েশার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতাও করেছিলেন। তাকে যুদ্ধের মহড়াও শিখিয়েছিলেন। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম। হযরত আয়েশা এর সাথে রাসূলের ভালবাসা ইতিহাসে দৃষ্টান্তমূলক। হযরত আয়েশা একদিন হাতে রৌপ্য নির্মিত দস্তানা পরেছিলেন। নবী (সাঃ) এসে জিজ্ঞেস করলেন

www.nagorikpathagar.org

হে আয়েশা, তোমার হাতে কি পরেছ? তিনি বললেন, আপনার সন্তুষ্টির জন্য এ দস্তানা পরিধান করেছি। তাঁর কাপড় চোপড় তিনি নিজে ধুয়ে দিতেন। পোশাকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতেন। মেসওয়াক শুকনো থাকলে চিবিয়ে মুখের লালায় মসৃন করে দিতেন। হযরত আয়েশা গ্লাসের যে পাশ দিয়ে পানি পান করতেন রাসূল (সাঃ) সে পাশ দিয়েই পানি পান করতেন।

রাসূল (সাঃ) কর্তৃক উপস্থাপিত দাম্পত্য জীবনের আদর্শ অনুসরণ না করার কারণেই পারিবারিক জীবনে এত অশান্তি। আজকে দেখা যায়, স্ত্রী স্বামীর সামনে যেন তেন পোশাক পরে কিন্তু ঘরের বাইরে অন্যের সামনে বেড়াতে সুসজ্জিত হয়। অথচ স্বামীর সামনেই সর্বোত্তম ভূষণ, সাজ-সজ্জা করার জন্য আল্লাহর রাসূল বলেছেন। পর পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা ও সংমিশ্রণ নিষেধ করা হয়েছে। বিয়ে যেন স্থায়ী ভালবাসার কারণ হয় সেজন্য আল্লাহর রাসূল বলেছেন, তুমি বিয়ের আগে কনেকে দেখ, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা সৃষ্টির জন্য এই দর্শন সহায়ক হবে। অথচ আজকাল কোথাও কোথাও ছেলের পিতা, ভাই বা দুলাভাই দেখতে যায় এটা নিষেধ। স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর করার জন্য উত্তম নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম। নারীকে স্বামীর সংসার রক্ষণাবেক্ষণ ও সন্তান লালনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীর সকল খরচ বহন করা। স্ত্রীর নিজস্ব আয়ের অধিকার আছে। সে আয় একান্তভাবে তারই থাকবে। দাম্পত্য জীবনে জিদ ও হঠকারীতা মুক্ত থাকতে হবে। গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে স্ত্রীর পরামর্শ নিতে বলা হয়েছে। নারী প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে জীবন যাপন ও পরস্পর ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি সুখী পারিবারিক জীবনের পূর্ব শর্ত। বর্তমানে যৌতুক প্রথা অনেক নারীর দুঃখ দুর্দশার কারণ। ইসলাম এটা হারাম ঘোষণা করেছে। মহরানা দেয়া ফরজ। অথচ আমাদের সমাজে উল্টো চিত্র। ক'দিন আগে একজন মা ৫ জন কন্যা সন্তান নিয়ে চলন্ত ট্রেনের নীচে আত্মহত্যা করেছে। কারণ যৌতুকের কারণে মেয়ে বিবাহ দিতে পারছেনা। সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে যদি আল্লাহর রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করা হত তাহলে পরিবারে স্বর্গীয় পরিবেশ বিরাজ করত, শান্তি রজায় থাকত।

সমাজ জীবনে মহানবীর আদর্শ

মহানবী (সাঃ) সমাজ থেকে মদ, জুয়া, ব্যভিচার, হত্যাসহ যাবতীয় সামাজিক ব্যধি দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। The life of Mohammad গ্রন্থে বার্মিংহাম বলেন মূলত আরবরা ছিল উচ্ছৃংখল ও বিভেদ প্রিয়। মুহাম্মদ (সাঃ) তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে দুঃসাধ্য এক আলৌকিক কাজ করেন। আল কুরআনে মদ হারাম ঘোষণার সাথে সাথে অলিতে গলিতে মদের নহর প্রবাহিত হল। অথচ আজকের বিশ্বে আমেরিকায় একবার মদ নিষেধের পর আবার বৈধতা দিতে হয়েছে। বাংলাদেশেও মাদাকাসক্তির করণে যুব চরিত্র দিন দিন নষ্ট হচ্ছে। সমাজ জীবনে জানমাল ইজ্জত আবরুর কোন নিরাপত্তা নেই। তিন বৎসরের শিশু থেকে শুরু করে ৮০ বছরের বৃদ্ধা ধর্ষিতা হচ্ছে। অথচ মহাগ্রন্থ আল কুরআন ঘোষণা করেছে, 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না' রেডিও, টিলিভিশন, ডিশ এন্টিনা, পর্ণ পত্রিকার অশ্লীল প্রচরণা যুব চরিত্র ধ্বংসের কারণ। সমাজ জীবনে ঘুষ

www.nagorikpathagar.org

ছাড়া কোন কাজ হয় না। অথচ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'যারা ঘুষ খায় এবং যারা ঘুষ দেয় উভয়ে জাহান্নামী।' সুদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। টেলিফোন, পানি, বিদ্যুৎ সর্বত্রই অপচয় হচ্ছে। জাতীয় সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। অথচ অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই আখ্যায়িত করা হয়েছে। মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। তাকওয়া হচ্ছে মর্যাদার মানদন্ড। লুণ্ঠন, হত্যা, দূর্নীতি, অত্যাচার, অবিচার, নারী নির্যাতন দূরীকরণে আখিরাতে জবাবদিহীর অনুভূতি সৃষ্টির বিকল্প নেই। প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, প্রত্যেকেই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এ অনুভূতি সকলের হৃদয়ে থাকলে সমাজ জীবনে সবাই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে।

সমাজে অপরাধ প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, দেশে প্রতি ১ লাখ লোকের ৮১.৪ জন লোক অপরাধমূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত রয়েছে। গৃহকর্তা কর্তৃক কাজের মেয়ে ধর্ষণ, শিশু অপহরণ, শিশু পাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে অথচ শিশুদের চরিত্র গঠন ও নিরাপত্তাদান অভিভাবকদের দায়িত্ব। সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে উলঙ্গপনা বেহায়াপনার আয়োজন করতে দ্বিধা-বোধ করছে না। অথচ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, 'লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ'। আজ হতাশার চূড়ান্ত সীমায় আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে যুব সমাজ। সমাজের দুর্বিষহ এ চিত্র বিশ্বের সর্বত্রই। সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে অবৈধ গর্ভপাতের সংখ্যা বিশ্বের সর্বাধিক। প্রতি হাজারে ৫ জন অবৈধ গর্ভপাত করছে। যুক্তরাষ্ট্রে চার বছরের এক শিশু তার ছয় বছর বয়সী খেলার সাথীকে বন্দুকের গুলি দিয়ে হত্যা করেছে। তুরস্কে প্রতি ৪ জন মহিলার মধ্যে একজন জীবনে একবার হলেও নির্যাতিত হচ্ছে। ৪০ বছরের কম বয়সী ৩ জন বৃটিশ নাগরিকের মধ্যে অন্তত একজন কোন না কোন পর্যায়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী। চীনে প্রতি ১০ জন কলেজ ছাত্রের মধ্যে ৮ জনই বিশ্বাস করে মেয়ে বন্ধু থাকা প্রয়োজন। পত্রিকায় খবর বেরুচ্ছে "দেশ আজ মদ, গাঁজা, হোরোইন ও ফেনসিডিলের স্রোতে ভাসছে।" বাংলাদেশের প্রায় ৪০ ভাগ যুবকই আজ বিপদগামী। তরুণদের নৈতিক অবক্ষয় ঠেকাতে মালয়েশিয়ায় ইসলামী শিক্ষার চেষ্টা জোরদার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মাদকদ্রব্য পাচারে জড়িত থাকায় কম্বোডিয়ায় পুলিশ কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জাপানের অর্থমন্ত্রী ঘুষ কেলেংকারীর দায়ে পদত্যাগ করেছেন।

সমাজ থেকে দূর্নীতি, অনিয়ম, নারী নির্যাতন, হত্যা, সন্ত্রাস রোধ করতে হলে রাসূলুলাহ (সাঃ) এর উপস্থাপিত আদর্শ ইসলামের অনুসরণ প্রয়োজন। তিনি পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ভালবাসার এক অনুপম নজীর স্থাপন করে গেছেন। হিংসা, বিদ্বেষ, ঠাট্টা বিদ্রুপ, মন্দ নামে কাউকে ডাকা থেকে সকলে বিরত ছিল। বিলাসিতা দূর, অপচয় বন্ধ, আনন্দে সীমালংঘন যেন না হয় সেদিকে তিনি ছিলেন সচেতন, লজ্জাশীলতা অবলম্ববন, অন্যায় উৎখাত সৎ কাজে পরস্পরের সহযোগিতা ছিল। যৌতুক নয় মোহর চালু করেছেন। বিধবা এবং পতিত নারীদের বৈবাহিক জীবন অবলম্বনের অধিকার দিয়েছেন। নারীকে শয়তানের শক্তি, অজগর সাপের মত রক্ত পিপাসু কিংবা পুরুষের প্রতারক বলে অভিহিত না করে আখ্যায়িত করা হয়েছে নারী

www.nagorikpathagar.org

পুরুষ উভয়ে সভ্যতা সংস্কৃতির নির্মাতা। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, দুনিয়ার জিনিসগুলোর মধ্যে নারী ও সুগন্ধিই আমার নিকট প্রিয়তর বানিয়ে দেয়া হয়েছে। মার্কিন মহিলা ডাঃ মারিয়াহ সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ইসলাম নারী জাতিকে যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে তার তুলনা পৃথিবীতে বিরল। Islam the misunderstood Religion. গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ (সাঃ) আরবের এমন একটি বংশে জন্মগ্রহণ করেন যারা পুতুল পূজা করত। জন্ম থেকেই এতীম মুহাম্মদ (সাঃ) সব সময় গরীব, অভাবগ্রস্ত, বিধবা, এতীমদেরকে দান এবং ক্রীতদাস ও নিগৃহীতদের পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর একটা বিরাট অংশের আমূল পরির্বতন করেছিলেন। আজকের সমাজের দুর্বিসহ, লজ্জাকর এ চিত্র আমরা পাল্টাতে চাই, চাই সুন্দর সুখী সমাজ। যেখানে থাকবেনা হিংসা-দ্বেষ। কায়েম হবে ভ্রাতৃত্ব ভালবাসার এক জান্নাতী পরিবেশ। এ জন্য প্রয়োজন মহানবীর আদর্শের বাস্তবায়ন।

দেশ পরিচালনায় মহানবীর আদর্শ

রাসূল (সাঃ) এর উপস্থাপিত আদর্শে ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা কোন সত্তা নয়। ধর্মের আলোকে দেশ চলবে। ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের ন্যায় Religion is the private relation between man and God এ ধারণা পোষণের সুযোগ নেই। বরং Islam is the complete code of life. হিসেবে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের অনুশীলন করতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালনায় রাসূল (সাঃ) এর দর্শন ছিলঃ

ক. সার্বভৌমত্ব আল্লাহরঃ আসমান-জমিন, আলো-বাতাস, পানি সকল সৃষ্টির মালিক আল্লাহ। মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহরই দান মানুষ আল্লাহর মর্জিমত এসব ব্যবহার করবে। মানুষ আল্লাহর খলীফা, আল্লাহ ছাড়া আইন রচনার অধিকার আর কারো নেই।

খ. রিসালাত বিশ্বাসঃ আল্লাহ তায়ালা সরাসরি মানুষের কাছে আইন তৈরী করে পাঠান না। নবী রাসূলের মাধ্যমেই পাঠান। তাঁরা তা কার্যকরী করেন। আল্লাহর আইন আমাদেরকে মেনে চলতে হবে রাসূল (সঃ) বাতলানো তরীকা অনুযায়ী।

গ. আখিরাতে জবাবদিহিঃ মানুষ বলগাহীন স্বাধীন নয়। মৃত্যুর পর তাকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। কৃত কর্মের জবাবদিহি করতে হবে।

ঘ. নৈতিক চরিত্র গঠনঃ মহানবী (সাঃ) কর্তৃক পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় শাসক ও শাসিত সবার নৈতিক চরিত্র ছিল উন্নত।

ঙ. আনুগত্যঃ মদ নিষিদ্ধ হল। অলিতে গলিতে শরাবের বন্যা প্রবাহিত হল। অথচ আমেরিকায় বহু কোটি টাকা ব্যয়ে মদ নিষিদ্ধের আইন পাশ করে আবার রহিত করতে হল।

চ. পরামর্শঃ আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম বিনা বাক্যে অনুসরণ করা হত। কিন্তু রাসূল (সাঃ) যে সব বিষয়ে আল্লাহর সরাসরি অহী পেতেন না তা পরামর্শ করে কাজ করতেন। কোন কোন সময় নিজের মত ত্যাগ করে সাহাবাদের মত গ্রহণ

www.nagorikpathagar.org

করতেন। বদর যুদ্ধে যে স্থানে সৈন্য সমাবেশ করেছেন। সে সম্পর্কে একজন সাহাবী বললেন, আপনি কি আল্লাহর হুকুম অনুসারে এ স্থান নির্বাচন করেছেন। না নিজের মত অনুসারে? উত্তরে নবী (সাঃ) বললেন, আমি নিজেই এ স্থান নির্বাচন করেছি। তখন সাহবী বললেন, এ স্থানের পরিবর্তে ঐ স্থানটি যুদ্ধের জন্য অধিক উপযোগী। রাসুল (সাঃ) তার মত গ্রহণ করেন।

ছ. নিরপেক্ষ বিচারঃ রাসূল (সাঃ) বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের কথা না শুনে রায় দিতেন না। কোন অন্যায় সুপারিশ গ্রহণ করতেন না। অভিজাত পরিবারের কেউ অন্যায় করলেও শাস্তি দিতেন। মুসলমান ও ইহুদীর মোকদ্দমায় অনেক সময় ইহুদীর পক্ষে তিনি রায় দিয়েছেন।

জ. জনগণ কর্তৃক সমর্থনপুষ্ট সরকারঃ রাসূল (সঃ) আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত। কিন্তু তিনি আল্লাহর আইন জনগণের সমর্থন পেয়ে সমাজ কায়েম করেছেন। অনেক নবী রাসূল জনসমর্থনের অভাবে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে পারেননি। রাসূল (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিযরত করে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেন।

ঝ. যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থাঃ সুদ নয়, যাকাতই ছিল অর্থনীতির চালিকাশক্তি। সম্পদ উৎপাদন, ভোগ ও সঞ্চয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। আধুনিক পুঁজিবাদী ও সমাজবাদের মধ্যমপন্থা ইসলাম। শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার, মুনাফায় শ্রমিকের অংশীদারিত্বের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বেকারত্ব ও ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দা করে ঘোষণা করেছেন সৎ শ্রমের দ্বারা উপার্জনই হচ্ছে পবিত্রতম উপার্জন। যে শ্রম করে খায় সে আল্লাহর বন্ধু। শ্রমিকের ঘাম শুকোবার আগে মজুরী দিতে বলা হয়েছে।

ঞ. যুদ্ধ ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ) এর আদর্শঃ তিনি ২৩ বছরের নবুওয়াতী জিন্দেগীতে অনেক যুদ্ধ করেছেন। ২৭টিতে সরাসরি সেনা নায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি নিজ সৈন্যদের পশ্চাত আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনসহ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। খন্দক যুদ্ধে নিজে পরিখা খননে অংশগ্রহণ করেছেন। আধিপত্য বিস্তার, রাজ্য দখল তাঁর যুদ্ধনীতি ছিল না। দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনই ছিল উদ্দেশ্য। অত্যাচার নির্যাতন থেকে জনগণকে রক্ষাই ছিল টার্গেট। মানুষের উপর থেকে গায়রুল্লাহর প্রভূত্ব উৎখাত করার জন্য আল্লাহর রাসূল জিহাদের অনুমতি দিয়েছেন। আগ্রাসনের জবাবে, সত্যের সংরক্ষণে যুদ্ধের যখন কোন বিকল্প থাকে না, তখনই আল্লাহর রাসূল জিহাদের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে অতর্কিত আক্রমণ, আগুনে পোড়ানো, নির্যাতনপূর্বক হত্যা, লুটতরাজ, সম্পদ নষ্ট, লাশ বিকৃতকরণ, দূত হত্যা, বন্দী হত্যা, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, নিষিদ্ধ। রাসূল (সাঃ) পরিচালিত যুদ্ধসমূহ তারই প্রমাণ। তাই রাসূল (সাঃ) এর যুগে ছোট বড় সকল যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা হাজারের বেশী হয়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নেহায়েতই কম। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ৬ কোটি লোক জখম হয়। হিরোশিমায় এটম বোমা বিস্ফোরণে ১০ মিলিয়ন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিগত মহাযুদ্ধের সমাপ্তিতে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ বলেছিলেন, যদি যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে আবার আগমন করেন তবে বেশী দিন

www.nagorikpathagar.org

তিনি বাঁচতে পারবেন না। তিনি দেখবেন যে, দু'হাজার বছর পরও মানুষ ফিতনা-ফাসাদ, রক্তপাত, খুন-জখম ও ধ্বংসযজ্ঞে বরাবরের মতই লিপ্ত। সে একটির মুকাবেলায় অধিকতর ধ্বংসাত্মক জীবন সংহার আরেকটি অস্ত্র আবিষ্কার করছে। আর চিন্তা করছে নিত্য নতুন শাস্তির প্রক্রিয়া ও কৌশল।

বন্দীদের সাথে তাঁর আচরণ সকলকে মুগ্ধ করেছে। মুসলিম সৈন্যদের হেঁটে বন্দীদের বাহনে চড়িয়েছেন। মুসলিম সৈন্যদের খাবার তাদের খেতে দিয়েছেন। বদর যুদ্ধে শিক্ষিত বন্দীদের দশজন মুসলমান বালককে লেখাপড়া শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে মুক্তি দিয়েছেন। যারা অশিক্ষিত তারা আর কখনও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না এ অঙ্গীকারের ভিত্তিতে মুক্তি দিয়েছেন।

একথা আজ পরিষ্কার তামাম বিশ্বের সমস্যা সমাধানে মহানবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। রাসূল (সাঃ) এর সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্বের অপপ্রচার মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। Islam at the crossroad গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়, ইতিহাস আজ এ সত্য প্রমাণ করেছে যে, ধর্মোন্মত্ত মুসলমানদের আক্রমণ এবং বিশ্বব্যাপী তরবারীর জোরে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাহিনী শুধুই ঐতিহাসিকদের মিথ্যাচার। বস্তুতঃ ইতিহাসে যত আজগুবি অতিকথন রয়েছে যার সঙ্গে সত্যের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এই অপপ্রচার তাদের অন্যতম। আনন্দের বিষয় যে, কয়েক বছর আগে আমেরিকায় Who is the greatest man of the world. প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সবচেয়ে বেশী মতামত এসেছে রাসূল কারীম (সাঃ) এর পক্ষে। পাশ্চাত্যের অন্যতম বিজ্ঞানী মাইকেল এইচ হার্ট তাঁর The Hundred গ্রন্থে একশত মহামানবের মাঝে মুহাম্মদ (সাঃ) এর স্থান সর্বপ্রথম দিয়েছেন।

মহানবী (সাঃ) দুনিয়া-আখিরাতে উভয় ক্ষেত্রে সর্বাধিক মর্যাদাবান। সর্বপ্রথম তিনিই পুলসিরাত অতিক্রম করবেন। নবী রাসূলগণ তাঁরই পতাকাতলে সমবেত হবে। তিনিই জান্নাতের দরজায় করাঘাত করবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁকে মাকামে মাহমুদ ও কাওসার দান করা হয়েছে।

আজকের বিশ্বে শান্তি, স্থিতি, কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে। ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে তাঁকে নেতা হিসেবে মানতে হবে। তিনি আল্লাহর দ্বীন কায়েমে বদর, অহুদ, তায়েফ, তবুক এর সম্মুখীন হয়েছেন। আমাদেরকে বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে মুক্তির পথ রচনা করতে হবে। কালেমা খচিত পতাকা উড়াতে হবে। কায়েম করতে হবে আল্লাহর দ্বীন। যে দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

অপরাধ মুক্ত সমাজ গঠনে প্রচলিত আইন ও মহানবীর আদর্শ

আমরা সুন্দর সমাজ চাই, অপরাধমুক্ত পরিবেশে চাই, কিন্তু কি দেখছি? ছোট শিশু চোখ মেলে অপরাধই দেখছে, অপরাধের কথা শুনছে। একটু বড় হলে হরহামেশা অপরাধের খবরই পত্রিকায় পড়ছে। প্রতিদিনই নানা পত্রিকায় নানা খবর বেরুচ্ছে- "৯৬ লাখ টাকার জন্য বিদেশ ফেরত ব্যবসায়ীকে অপহরণ" "কিল, ঘুষি থাপ্পড় মেরে ছিনতাই" "দেবরের নিক্ষিপ্ত এসিডে ঝলসে গেছে ভাবীর শরীর" "হাসপাতালের মাইক্রোস্ক্রোপ চুরি" "ডিবি পুলিশ একজনকে পিটিয়ে হত্যা" পুলিশ কনস্টেবলের চেইন ও টাকা ছিনতাই" "পাষন্ড স্বামী নিজের স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে পাচারকারীদের নিকট বিক্রয়" (নুতনপত্র-সেপ্টেঃ৯৭) "ব্যাংকের টেবিল থেকে দেড় লাখ টাকা ভর্তি ব্যাগ হাওয়া" (ভোরের কাগজ) "সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা করায় ৪০ বছরের আম্বিয়া বেগমকে তার বাড়ীর সামনে কুপিয়ে, গোপনাঙ্গে বাঁশ ঢুকিয়ে হত্যা করা হয়, স্বামী হত্যা মামলা করায় তাদের আত্মীয় স্বজনের ৪০টি বাড়ী-ঘর আগুনে পুড়িয়ে দেয়" শুধু কি চিহ্নিত অপরাধীরা অপরাধ করছে? যে পুলিশ প্রশাসন অপরাধ দমনের মহান দায়িত্বে নিয়োজিত তারাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। সাপ্তাহিক রোববার ৩১ আগস্ট '৯৭ রিপোর্ট অনুযায়ী "পুলিশ রেকর্ডে দেখা গেছে '৯৬ সালে পুলিশ ৩৪০টি অপরাধ করেছে" আরেক পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী গত বছর খোদ পুলিশ বাহিনীর হাতেই মারা যায় ৪৮ জন মানুষ, নির্যাতনের ঘটনা ঘটে ৪ হাজার, ধর্ষিত হয় ১১ জন মহিলা" চাঁদাবাজি করত গিয়ে পুলিশ ধৃত হবার পর প্রশ্ন জাগে সরষে যদি ভূত থাকে ভূত তাড়াবে কে? জালিয়াতি ও দুর্নীতির দায়ে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কর্মকর্তা গ্রেফতার হচ্ছে (সুগন্ধা ১৭ অক্টোবর '৯৭')। মাত্র ২ টাকায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টাকার জাতীয় সম্পদ অবাধে ভারতে পাচার হচ্ছে, মুক্তকণ্ঠের খবর অনুযায়ী 'ভারতের রাসায়নিক কারখানাগুলোতে ছাইয়ের ব্যাপক চাহিদা থাকায় চোরাকারবারীরা সেখানে প্রচুর পরিমাণে ছাই পাচার করছে।' পরকীয়া প্রেমে ৭৭ বছরের বৃদ্ধার সাথে ১৪ বছরের তরুণীর বিয়ে, ৩ বছরের শিশু থেকে ৮০ বছরের বৃদ্ধা ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯৬-৯৭ সনের ১১ মাসে "১৩৭৫টি খুন, ২৫১টি ধর্ষণ, ৬৬টি এসিড নিক্ষেপ, ৪২২টি ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয়। গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে নিহত হচ্ছে মানুষ (সোনার বাংলা, ৩রা জুলাই '৯৭) মাদক ব্যবসা জমজমাট, পুলিশের নাকেরডগায় ফেনসিডিল ও গাঁজার আসর হয়, মাদকাসক্ত পুত্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পিতা কর্তৃক পুত্রকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করার ঘটনাও ঘটেছে। তাহলে আমাদের সমাজ কোথায় গিয়ে পৌছেছে?

www.nagorikpathagar.org

সৎপিতা কর্তৃক কন্যা ধর্ষণের পরও আমরা কি আধুনিক সভ্যতার দাবীদার? পুলিশ হেফাজতে থাকাবস্থায় কিভাবে কারাগারে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হয়? কোথায় জন নিরাপত্তা? যার কারণে জাতীয় সংসদে একজন এম, পি বলেছেন– মাননীয় স্পীকার, স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারন্টি চাই। আমাদের সমাজে 'নুনের চেয়ে খুন যেন অধিক সস্তা', সমাজ জীবনে অপরাধ প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরাধ দমনে 'প্রচলিত আইন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ব্যর্থ, তাই 'দেড়কোটি টাকা ব্যয়ে ডগ স্কোয়াড আমদানী করা হচ্ছে' (*বাংলাবাজার*), আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের অপরাধ দমনে চতুষ্পদ জন্তুর সাহায্য নিতে হচ্ছে। এর চেয়ে লজ্জাস্কর আর কী হতে পারে?

বর্তমান প্রচলিত আইনের সংস্কার ও কঠোর আইন প্রণয়নের চিন্তা চলছে। খোদ আইনমন্ত্রী বলেছেন, 'অপরাধী সাজা পাইবে বুঝিতে পারিলে অপরাধ কমিয়া যাইবে।' মানুষ একে অপরকে যেভাবে খুন করে, হাত পা কর্তন করে, অগ্নি দগ্ধ করে হত্যা করে চতুষ্পদ জন্তু কি সেভাবে করে? একটি কুকুর আরেকটি কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখি, কিন্তু চোখ উপড়িয়ে, গরম পানি ঢেলে, বস্তাবন্দী করে টুকরো টুকরো করে হত্যা করতে কখনও কি দেখি? আমরা 'খাইরাহ উম্মাহ' শ্রেষ্ঠ জাতি কোথায় আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের নমুনা! আমরা "উম্মাতে ওয়াসাত" মধ্যমপন্থী জাতি, আমলে আখলাকে আচরণে ব্যবহারে তার প্রমাণ কি রাখতে পারছি? গ্রহে গ্রহে সংঘাত, নক্ষত্রে নক্ষত্রে সংঘর্ষ হতে দেখিনা, অথচ মানুষে মানুষে সংঘর্ষ প্রতিদিনই হচ্ছে কারণ কী? কারণ মহাবিশ্বের সর্বত্রই যেখানে আল্লাহর আইন চালু আছে সেখানে শান্তি আছে, অপরাধ নেই তাহলে মানব সমাজে এত অপরাধ কেন? কারণ একটিই "আল্লাহর আইন ও রাসূল (সাঃ) এর আদর্শের অনুপস্থিতি।" রাসূলের আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে মা তার কন্যাকে স্কুলে পৌছাতে গিয়ে ধর্ষিতা হতে হবে না। ছেলে ধরা আতংকে গণপিটুনীতে কাউকে খুন হতে হবে না। রাসূলের আদর্শে বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ নয় সকলের স্বার্থ রয়েছে। প্রবৃত্তির প্রভাবে অনৈতিক কিছু যেন সংঘটিত না হয় তাই নৈতিক চরিত্র সংশোধন ও ব্যক্তির নৈতিক প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বর্তমান প্রচলিত আইনে সামাজিক অপরাধের জন্য কিছু দন্ডবিধানের উল্লেখ থাকলেও একজন ব্যক্তির সামগ্রিক জীবন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই। অথচ আল্লাহর রাসূল সামগ্রিক জীবন পরিশুদ্ধ করার জন্যই আবির্ভূত হয়েছে। বর্ণ, গোত্র, দেশ, অঞ্চল, বা ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ সুযোগ থাকায় সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে অপরাধীর দন্ড মওকুফ করতে পারেন। অথচ রাসূলের আদর্শে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসক-শাসিতে, ধনী-গরীবে, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গে আইন প্রয়োগে পার্থক্যের সুযোগ নেই।

আমরা আইয়ামে জাহেলিয়াতের ইতিহাস পড়েছি! কি নৃশংস বর্বরতা। পিতা

www.nagorikpathagar.org

তার আপন কন্যাকে জীবন্ত কবর দিত। উহ! কি নিষ্ঠুরতা। মদ জুয়া তাদের মজ্জাগত অভ্যাস ছিল। মাতাল হয়ে ছুটোছুটি করত, উলঙ্গ হয়ে ঘুরত কি নোংরা মানসিকতা? সামান্য কারণে চল্লিশ বছরের চেয়েও বেশী সময় ধরে অব্যাহত যুদ্ধ। কি উদ্ভুত যুদ্ধংদেহী মনোভাব? নীতি নৈতিকতার কোন বালাই ছিল না। অপরাধ করাই ছিল তাদের অভ্যাস। কিন্তু সে সমাজ কিভাবে পাল্টে গেল? কিভাবে অপরাধী নিজের দোষ স্বীকার করে দন্ড প্রাপ্তির মানসিকতা নিয়ে দন্ড চাইত? ভেবে দেখুন সে সমাজ কিভাবে অপরাধমুক্ত হল?

আল্লাহর রাসূল আবির্ভূত হলেন। ডাকলেন সবাইকে। আহবান জানালেন "আল্লাহর আইন মেনে চল কল্যাণ পাবে।" তাই তারা রাসূল (সাঃ) এর কল্যাণে কল্যাণময় সমাজ পেলেন। যারা মদে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা মদ ছেড়ে দিলন। অথচ আজকের সমাজে মাদকাশক্তি এত প্রবল হয়েছে পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী "বর বিয়ে মজলিশে যাবার পূর্বে মদপান করেছে। অনুষ্ঠানে মাতলামী শুরু করায়, কনে পক্ষ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে অবশেষে তাকে বাদ দিয়ে নতুন বরের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা। মাদকাসক্তি, ব্যাভিচার, চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাবী, ধোঁকাবাজী, চোরাকারবারী, মজুতদারী, ছিনতাই, হাইজ্যাক আমাদের সমাজ জীবনের নিত্যদিনের চিত্র, আমরা সুন্দর সমাজ চাই, অপরাধমুক্ত বিশ্ব চাই। কিন্তু কিভাবে? রাসূল (সাঃ) এর আদর্শের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ছাড়া কি তা সম্ভব? প্রচলিত আইনে নয় রাসূল (সঃ) প্রদর্শিত পন্থায় আল্লাহর নির্দেশিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবল অপরাধ নির্মূল হতে পারে। প্রচলিত আইনে নয় রাসূল (সাঃ) এর আদর্শ বাস্তবায়নই যে অপরাধ দমনে কার্যকর তার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হলঃ

(১) মাদকাসক্তি

মাদকাসক্তি বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার জন্য হুমকি স্বরূপ। অতি প্রাচীনকাল থেকে এর ব্যবহার চলে আসলেও মাত্র তিন দশক পূর্বে মাদক দ্রব্যের এতটা আধুনিক ব্যবহার ছিল না। কিন্তু বর্তমানে মরণ জুয়েলা, আফীম, কোকেন, এ্যালকোহেল, ক্যান্যাবিম, মদ, সিডাব্রিন, হেরোইন, প্রভৃতি মাদক দ্রব্য নৈতিকতা বিধ্বংসী কাজে কামানের ন্যায় কাজ করছে। এর ফলে হত্যা ধর্ষণসহ নানাবিধ অসামাজিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদক দ্রব্য পাচারকারী ও আসক্তদের হাতে গত কয়েক বছর আগে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সিনেটর লুইস কার্লোস গ্যালেন। তার আগে নিহত হন আরেক বিচারপতি। বিশ্বের প্রায় ৫০ কোটি মানুষ মাদকের শিকার। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি বছর পৃথিবীর প্রায় ১০ হাজার লোকের মৃত্যু হয় ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণের পরিণামে। তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ বাংলাদেশ, এক তথ্যানুযায়ী মাদক দ্রব্য সেবীর সংখ্যা ১২ লক্ষাধিক। আর এ ব্যবসায়ের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন অনেক বড় বড় "রুই কাতলা" ব্যক্তিরা।

www.nagorikpathagar.org

ইনজিকশন জাতীয় মাদক দ্রব্যের সুবাদে অনেক কোটিপতিও পেথড্রিন ইনজেকশন নিয়ে নেশা করছে। যুব সমাজ মাদক সেবন করে নারী আসক্ত হচ্ছে। স্ফূর্তিবাজরা মাদক সেবন করে বাস, ট্রাক থামিয়ে চাঁদা আদায় করে, ভাসমান পতিতাদের এনে অসামাজিক কাজ করছে। অনেক সড়ক দুর্ঘটনার কারণ এই মাদকাসক্তি। এর ফলে দুরারোগ্য ব্যাধিরও প্রসার ঘটছে। নৈতিক গুণাবলী হ্রাস পেয়ে অনৈতিকতায় ছেয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর বিরুদ্ধে গণসচেতনা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। "ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর" সিগারেটের প্যাকেটে এ ধরনের হাস্যস্পদ লেখা তারই প্রমাণ। আমাদের দেশে মাদক চোরাকারবারীদের ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। তার পাশাপাশি সরকারের অনুমোদন পেয়ে দর্শনার কেরু এন্ড কোম্পানীসহ অনেকখানে মদ উৎপাদন করে বিতরণের ব্যবস্থা চালু আছে। প্রচলিত আইনে মাদকাসক্তি তখনই অপরাধ বলে বিবেচিত হয় যখন প্রকাশ্যে কোন স্থানে, কিংবা রাজপথে মাদকাসক্ত ব্যক্তি জনগণের চলার পথে বাধার সৃষ্টি করবে, জান মালে ক্ষতি করবে বা আইন ভংগ করবে। আর এ সময় যে শাস্তির বিধান তা মূলতঃ মাদকাসক্তির কারণে নয় বরং আইন ভংগ বা জানমালের ক্ষতির জন্য। মাদক ব্যবসা সরকারের অনুমোদন নিয়ে হলে বৈধ, চোরাকারবারীদের শাস্তি মাদক দ্রব্য পাচারের জন্য নয় বরং সরকারের অনুমোদন না নিয়ে করার জন্য। কিন্তু ইসলাম 'মদকে' ক্ষতিকারক আখ্যায়িত করে হারাম ঘোষণা করেছে। অবশ্য এটি ৩টি ধাপে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে।

প্রথমতঃ যখন আল্লাহর রাসূলকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানালেন এতে ক্ষতি ও উপকার দু'টোই আছে। তবে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি, এর মাধ্যমে মদের প্রতি নিরুৎসাহিত করা হল।

দ্বিতীয়তঃ সাময়িক নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কুরআনে বলা হয়েছে মাদকাসক্ত অবস্থায় নামায না পড়ার জন্য। এর মাধ্যমে মদপান থেকে বিরত রাখার অভ্যাস সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ মদপানকে শয়তানের কর্ম বলে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। মদপান হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন 'যা নেশা সৃষ্টি করে, কম হউক বা বেশী হউক তা হারাম' অপর এক হাদীসে এসেছে আল্লাহর অভিশাপ মদপানকারী, ও পরিবেশনকারীর উপর, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের উপর। মাদক দ্রব্য সেবনকারী ব্যক্তির নিজের স্বীকারোক্তি বা দুইজন সৎ মুসলিম ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দন্ড প্রদান করা হবে, মাদক দ্রব্য সেবন যেমন অন্যায় তেমনি এর ব্যবসাও অপরাধ।' কারণ ইসলামী অপরাধ দর্শনে যে জিনিস ভোগ করা অবৈধ, তার উৎপাদন ও বিক্রীও অবৈধ' উল্লেখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে মহানবীর আদর্শ সমাজ জীবনে বাস্তবায়িত হলে অপরাধ থাকার কথা নয়। কারণ মদ্যপানের অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তি কার্যকর অপরিহার্য।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও আহমদ (রহঃ) এর মতে অনুযায়ী ৮০টি বেত্রাঘাত তার শাস্তি। হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাঃ) এ ধরনের দন্ড কার্যকর করেছেন বলে উল্লেখ আছে। হযরত ইমাম শাফেয়ীর মতে চল্লিশ বার বেত্রাঘাত তার শাস্তি। মদপানের দন্ডের পরিমাণ সম্পর্কে মত পার্থক্য থাকলেও এ বিষয়ে সকল ইমামই একমত। মদপান, উৎপাদন ও বিক্রি দূষণীয় নয় বলে যে বিধান রয়েছে তা অযৌক্তিক কারণঃ-

(ক) মদ লাইসেন্স দিয়ে উৎপাদন বা আমদানী এবং চোরাপথে আমদানী সমাজ জীবনে সমভাবে ক্ষতিকর।

(খ) 'গোপন মাদকদ্রব্য সেবন করলে দন্ড নেই' এ ধরনের বিধান নৈতিক অনুভূতি শিথিল করে যা অন্যান্য অপরাধের প্রতিও উদ্বুদ্ধ করে।

(গ) 'বিষ' যেমনি ভাবে সর্বাবস্থায় দেহের জন্য ক্ষতিকারক, মাদক দ্রব্যও তেমনিভাবে ক্ষতিকর।

(ঘ) মাদকাসক্তি নারী ধর্ষণের প্রতি ধাবিত করে। যা সর্বাবস্থায় সমান।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে মাদকতা কেন্দ্রীক অপরাধ নির্মুলে প্রচলিত আইন নয় মহানবীর আদর্শ তথা ইসলামী আইনই অধিক উপযোগী।

(২) ব্যাভিচার

ধর্ষণ বর্তমানে অধিকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশু কন্যা তানিয়াসহ সকল বয়সের নারীরাই ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। ধান আনতে গিয়ে ধর্ষণ, আদালত প্রাঙ্গনে ধর্ষণ, গৃহকর্তা কর্তৃক ধর্ষণ, মায়ের সামনে মেয়ের ধর্ষণ, স্বামীর হাত পা বেঁধে স্ত্রী ধর্ষণ, পুলিশ কর্তৃক গৃহবধু ধর্ষণ, ডাক্তার কর্তৃক রোগিনী ধর্ষণ, শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী ধর্ষণ হর হামেশাই হচ্ছে' আমি মনে করি গণহারে ধর্ষণ বৃদ্ধির কারণ আল্লাহর আইন তথা মহানবীর আদর্শের অনুপস্থিতি। বর্তমান প্রচলিত ফৌজদারী দন্ডবিধির ৪৯৭ ধারা মতে "নারীর সহিত যৌন সঙ্গম তখনই ধর্ষণ হবে যখন তস্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মতি ব্যতিরেকে, জোরপূর্বক সম্মতি নিলে, তস্যা পনের বছরের কম বয়সের হলে সম্মতিসহ বা ছাড়া ধর্ষণ হবে। প্রচলিত আইনে সাবলিকা নারীর-সম্মতিতে হলে ধর্ষণ হবে না। তাই অপরাধ বাড়ছে। অতি সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী অপ্রাপ্ত বয়স্কা এক কন্যাকে পতিতালয় থেকে পুলিশ ধরার পর প্রাপ্ত বয়স্কের লাইসেন্স দেখিয়ে আবার নিয়ে যাওয়া হয়। এজন্য শিশু ধর্ষণ ও শিশু পতিতার সংখ্যাও বাড়ছে। এক তথ্যানুযায়ী ভারতে পতিতাদের ২০% শিশু। শুধু বোম্বাইতেই শিশু পতিতার সংখ্যা বিশ হাজার। আরেক তথ্যানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি মিনিটে একজন মহিলা ধর্ষণের শিকার হয়। প্রতি বছর ৩০-৪০ লক্ষ মহিলা নির্যাতনের শিকার হয়। প্রতি সেকেন্ডে একজন মহিলা প্রহৃত হয়। প্রতি ৫ জন মহিলার মধ্যে ৩ জন অপরাধের শিকার হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণের হার বৃটেনের চেয়ে ১৩ গুণ, জার্মানীর চেয়ে ৪ গুণ, জাপানের চেয়ে ২০ গুণ বেশী। আমেরিকায় ১৪ বছরের কিশোরীদের শতকরা

www.nagorikpathagar.org

২৫ ভাগ অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়। অতিসম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী ১৩ বছরের বয় ফ্রেন্ডের মাধ্যমে ১২ বছরের কন্যা মা হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৮৪ সালের এক তথ্যানুযায়ী কিশোরী মায়েরা তের হাজার শিশুর জন্ম দেয়। তাই পাশ্চাত্যের মনীষী উইলিয়াম সরোকিন দুঃখ করে বলেছেন "We are living in a dying Culture. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সের পরিসংখ্যানে ৫০% সন্তানই অবৈধ। OS ward sedwarl বলেন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালিতে প্রতি হাজারে দশজন পুরুষ ও স্ত্রী বিবাহে আগ্রহী নয়। ইউরোপে ৭৫%জন স্বামী গোপনে পরস্ত্রীর সাথে মিলিত হয়। ৮০% অবিবাহিত পুরুষ বালিকা বাদির সাথে মিলিত হয়। চীনে প্রতি দশজনে ৮জন ছাত্র Girl friend রাখার পক্ষে, আমাদের দেশেও প্রতি ১ লাখ লোকের মধ্যে ৮১.৪ জন লোক অপরাধমূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত রয়েছে।

ইসলামী আইন অনুযায়ী বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে অনুমোদিত পন্থা ছাড়া যে কোন প্রকারের যৌন মিলন অবৈধ। উভয়ের সম্মতিতে হউক বা না হউক। এমতাবস্থায় ব্যক্তির স্বীকারোক্তি বা চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী বা প্রামাণ্য নিদর্শনের ভিত্তিতে যেনার দন্ড কার্যকর হবে। কুরআনের বাণী অনুযায়ী আল্লাহর রাসূল অনুরূপ দন্ড কার্যকর করেছেন। অপরাধী অবিবাহিত হলে একশ বেত্রাঘাত।

যারা এ ধরনের দন্ডকে মানবতা বিরোধী বলে চেঁচামেচি করেন তাদের চোখের সামনে একজন নারীকে গণধর্ষণের মাধ্যমে রক্তাক্ত করে গোপনাঙ্গ জখম করে খুন করাকে কি বলে আখ্যায়িত করবেন? স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে অপহরণ করে নিয়ে ধর্ষণ কি প্রগতিশীল রুচির পরিচায়ক? আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও খেলাফতে রাশেদার যুগে হাতে গোণা কয়েকটি Rape Case হয়েছে অথচ বর্তমানে পত্রিকার পাতা উল্টালে ধর্ষণের খবর। এ জন্য সরকার কঠোর আইন প্রণয়নের চিন্তা করছেন। আমি মনে করি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যে আদর্শের মাধ্যমে এ ধরনের অপরাধ নির্মুল করেছেন, সে কালজয়ী ইসলামী আদর্শ সমাজ জীবনে বাস্তবায়ন ছাড়া অপরাধ প্রবণতা দূর করা সম্ভব নয়।

(৩) চুরি

দন্ডবিধির ৩৭৮ ধারা মতে "কোন ব্যক্তির অধিকার থেকে কোন অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া অসাধুভাবে নেবার উদ্দেশ্যে এরূপ নেওয়ার জন্য উক্ত সম্পত্তি যে অপসারণ করবে সে চুরি সংগঠন করেছে বলে অভিহিত হবে" সূরা নিসার ২৯নং আয়াত অনুযায়ী একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা চুরি। ইসলামী জীবন দর্শনে যে পুরুষ বা নারী চুরি করবে তার হাত কেটে দিয়ে কৃত কর্মের সাজা দিতে হবে, অবশ্য সেটা তখন কার্যকর হবে যদি রাষ্ট্র অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ মৌলিক সমস্যার সমাধান করে। অভাবের কারণে নয় স্বভাবের কারণে চুরি করলে তখনই ইসলামী দণ্ড কার্যকর হবে। ইসলামী রাষ্ট্র নাগরিকদের

www.nagorikpathagar.org

মৌলিক দায়িত্ব বহন করে, নৈতিক সংশোধনের পর এ ধরনের দণ্ড কার্যকর করাকে অনেকে অমানবিক বলেন। প্রচলিত আইনে অবস্থাভেদে তিন বছর, সাত বছর বা দশ বছর সশ্রম বা বিনা শ্রম কারাদণ্ডের বিধান থাকলেও তা একদিকে কার্যকর হচ্ছে না, অপরদিকে এ আইন চুরি রাহাজানি বন্ধ করতে অকার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। অথচ আল্লাহর রাসূলের যুগে এ ধরণের ঘটনায় একবার দণ্ডকার্যকর হবার পর পুরো সমাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজিত ছিল। মানুষ ঘরের দরজা খুলে ঘুমোতে পারত। অথচ আজকের সমাজে টাকা নিয়ে ঘর থেকে বেরুতে ভয়, ঘরে ভাল কোন সম্পদ রাখলে চুরি ডাকাতির ভয়ে অস্থির থাকতে হয়।

আমাদের সমাজে অপরাধ যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এখনই যদি তা নির্মূলে পদক্ষেপ নেয়া না হয় তাহলে সমাজ অপরাধীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে। এজন্য গণচেতনা ও অপরাধীকে সামাজিক বয়কট প্রয়োজন। সম্প্রতি প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকায় রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে অভিভাবকগণ সন্ত্রাসী ছেলেদের পুলিশের হাতে সোপর্দ করছেন। একটি জেলায় ১৬ জন যুবককে মদের অবৈধ কেন্দ্রের সংবাদ দেয়ায় পুরস্কৃত করা হয়েছে। তার পাশাপাশি নানা অপরাধে ৯২ জন ডাক্তারের চাকুরী হারাবার খবরও প্রকাশিত হয়েছে। সরকারকে প্রচলিত আইনের ফাঁক ফোকরে অপরাধী ছাড়া পাবার পথ বন্ধ করতে হবে। আল্লাহর রাসূল বলেছিলেন, "আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করত তার হাত কর্তন করতাম।" সকল ক্ষেত্রে সমভাবে আইন প্রয়োগ করতে হবে। প্রভাবশালীদের "সাতখুন মাফ" এ প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। জনগণের নৈতিক চরিত্র সংশোধনে রেডিও টিভিতে ইসলামী আদর্শের প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা চালু করতে হবে। সর্বোপরি সকল ক্ষেত্রে মহানবীর আদর্শ কায়েম করার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

আল কুরআন ঐশী গ্রন্থ হওয়ার প্রমাণ ও কতিপয় সংশয় নিরসন

আল-কোরআন বিশ্ব মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা পবিত্র গ্রন্থ। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বদৌলতেই বর্বর বেদুইন জাতি বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সুসভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছিল। এটা শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, এতে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের মনোরম বর্ণনা, মানব জীবনের সকল সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান। কুরআনের ভাষায়, (ফিহি তিবইয়ানুন লিকুল্লি শাইয়িন) মুসলিম উম্মাহ যুগ যুগ ধরে এ কিতাবের নির্দেশনানুযায়ী জীবনযাপন করছে। এ গ্রন্থ 'মুসলিম মিল্লাতের জন্য পূতপবিত্র সংবিধান। এ প্রসঙ্গে ড্যাভেন পোর্ট বলেন, The Quran is the general code of the Muslim world, a social, civil, commercial, military, judicial, criminal, penal and yet religious code by it everything is regulated from the cermonious of religion to those of daily life. From the salvation of the soul to the health of the body from the rights of the general community to those of cach individual. From the interest of man to those of society from punishment here to that of the life to come." বিশ্বের যতো গ্রন্থ রয়েছে অন্য কোন গ্রন্থ মহান আল কুরআনের সমপর্যায় ভুক্ত নয়। অধ্যাপক মার্গলিউথ বলেছেন, পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থ সমূহের মধ্যে কুরআন যে একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী তা স্বীকার করতেই হবে। "Life of Mohammad গ্রন্থে মুইর বলেন There is probably in the world no other book has remainded twelve centuries with so is pure" অধ্যাপক কারলায়ল বলেন, 'আমার নিকট কুরআন সত্যতা ও বিশ্বস্ততার একটি জীবন্ত প্রতীক, দুনিয়াকে সুন্দর ও শান্তিময় করা এই কিতাবখানির মাধ্যমেই সম্ভব।' মহাগ্রন্থ আল কুরআনই মুসলমানদের সফলতার মূল শক্তি। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পন্ডিত ইমানুয়েল ডুয়েচ বলেছেন, এই একমাত্র গ্রন্থখানার সাহায্যেই আরবরা আলেকজান্ডার ও রোম অপেক্ষা বৃহত্তর ভূ-ভাগ জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। রোমের যতো শত বছর লেগেছিল তাদের বিজয় সম্পূর্ণ করতে আরবদের লেগেছিল তত দশক।' মিঃ এ ডিশরিল বলেন, 'কুরআনই হলো ইসলামের শক্তি ও বিজয়ের উৎস। কুরআনে মানব জাতির জন্য যেমন বুনিয়াদী আইন কানুন রয়েছে, তেমনি রযেছে মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টি।'

কুরআন নাজিলের পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। প্রসিদ্ধ খৃষ্টান ঐতিহাসিক বাডলে বলেন, 'কেবলমাত্র কুরআনই এমন একখানা গ্রন্থ যাতে তেরশ' বছরের ব্যবধানে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। উইলিয়াম মুইর বলেছেন, 'কুরআন সংগ্রহকারীরা কুরআনের কোন অংশ,

www.nagorikpathagar.org

বাক্য কিংবা শব্দ বাদ দিয়েছে এমন কখনও শোনা যায়নি, আবার কুরআনে এমন কোন বাক্যেরও সন্ধান পাওয়া যায় না যা বাহির হতে কুরআনে প্রবেশ করেছে।'

কুরআনের বাক্যবিন্যাস অপূর্ব, এর বর্ণনাশৈলী হৃদয়গ্রাহী। জন ফাস 'দি উইসডম অব দি কুরআন' গ্রন্থে লিখেন, প্রাচীন আরবীতে অবতীর্ণ কুরআন শরীফ অত্যন্ত মনোরম ও আকর্ষণীয়। এর বাক্য বিন্যাস পদ্ধতি ও প্রকাশ ভঙ্গিখুবই মনমুগ্ধকর। কুরআনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়াতগুলোতে যে বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তা খুবই চমৎকার। কুরআনের ভাব অন্য ভাষায় যথাযথভাবে প্রকাশ করা খুবই মুশকিল।

সমগ্র আসমানী গ্রন্থের মধ্যে কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে মানব জতির উদ্দেশ্যে এই সর্বোৎকৃষ্ট কিতাবখানা নাজিল করেছেন। কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব অলৌকিকতা সত্ত্বেও যুগে যুগে কুরআন সম্পর্কে অনেকেই বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর সংশয় প্রকাশ করেছেন। নানা ধরনের প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। কুরআন নাজিলের সময় যেসব সন্দেহ কিংবা প্রশ্ন করা হতো কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তার উল্লেখ রয়েছে। বর্তমান যুগেও কুরআন সম্পর্কে নানাবিধ বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের অবতারণা করা হয়। নিম্নে তার কতিপয় উদাহরণ তুলে ধরা হলো–

১. কুরআন আল্লাহর বাণী নয় রাসূল (সাঃ) বা জীনের বচন, কুরআনে এ সন্দেহের জবাবে বলা হয়েছে, 'ইনকুনতুম ফি রাইবিম মিম্মা নাযযালনা আলা আবদিনা ফাতু বিছুরাতিম মিন মিছলিহি -----' অর্থাৎ যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দাহের প্রতি অবতীর্ণ করেছি তাহলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস, তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদের সঙ্গে নাও এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো (বাকারাঃ ২২)। কুরআনে বর্ণিত এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তৎকালীন পন্ডিতগণ ব্যর্থ হয়ে বলেছিল, 'লাইছা হাযা কালামুল বাশার' এটা মানুষের রচিত কোন গ্রন্থ নয়। সূরা বনী ইসরাইলের ১০নং রুকুতে এরশাদ করা হয়েছে, "আপনি ঘোষণা করে দিন জগতের সমগ্র মানব ও জ্বিন জাতি মিলেও যদি এ ধরনের একখান কুরআন তৈরী করার চেষ্টা করে তাহলেও তারা তা পারবে না যদিও তারা এ ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় সকল যুগের সেরা সেরা পণ্ডিতগণ ব্যর্থ হয়েছেন।

২. কুরআন ঐশী গ্রন্থ নয় বরং যাদু। কুরআনে বলা হয়েছে, "ইযা তুতলা আলাইহিম আয়াতুনা বাইয়িনাতিন কালাল্লাজিনা কাফারু.... হাযা ছেহরুমমুবীন" মূলতঃ যখন তাদের সামনে কুরআন পড়া হতো তখন এর যাদুকরী প্রভাবে রাসূলের (সাঃ) প্রতি অনেকেই ঈমান আনতো। কুরআনের বাণী শোনার জন্য পাগল প্রায় হতো। কিন্তু এটা কোন যাদু গ্রন্থ যে নয় তা সুস্পষ্ট। একটি যাদু গ্রন্থে যেসব মন্ত্র থাকে কুরআন এমন কোন মন্ত্রের দীক্ষা দেয় না।

www.nagorikpathagar.org

৩. কুরআন গণকের বচন এটা আল্লাহর বাণী নয়। কাফেরদের এহেন প্রশ্নের জবাবে সূরা আল হাক্কার ৪০-৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই এ কুরআন একজন সম্মানিত রাসূলের আনীত এবং এটা কোন কবির কালাম নয় তোমরা কমই বিশ্বাস করো এবং এটা কোন অতীন্দ্রবাদীর কথা নয় তোমরা কমই অনুধাবন করো। এটা বিশ্ব পালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ, সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করতো তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে দেখতাম অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না।"

প্রকৃতপক্ষে গণকের কথার প্রকৃতি ও কুরআনের ভাষায় কোন মিল নেই। কোন মানুষের পক্ষে এ ধরনের রচনা সম্ভব নয়।

৪. কোন কোন কাফের এটাকে শয়তানের উক্তি বলে অভিহিত করতো। কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম পরিচয়ধারী কুখ্যাত মুরতাদ সালমান রুশদী "The Satanic Verses" গ্রন্থে লিখেন, "Quran has satanic verses." কুরআনে এ প্রসঙ্গে সূরা তাকবীরের ২৬-২৭ আয়াতে বলা হয়েছে, এটা বিতাড়িত উক্তি নয়, অতএব তোমরা কোথায় যাচ্ছ এটা তো কেবল বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ।

৫. কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ তাই অপরাপর ভাষাভাষীগণ এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন জরুরী নয়। কেননা তা থেকে শিক্ষালাভ অসম্ভব। ১৯৪৪ সালে পাকিস্তানের তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় অক্টোবর সংখ্যাতে এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে মাওলানা মওদূদী (রঃ) লিখেছিলেন, "কোন ভাষাতে ফায়দা লাভের জন্য সে ভাষাভাষী হওয়া আবশ্যক নয়, যেমন ইংরেজী ও ফার্সি গ্রন্থ সমূহ থেকে বর্তমানে আমরা ফায়দা অর্জন করি।" কুরআনের শিক্ষা সার্বজনীন, কুরআন যার উপর অবতীর্ণ তিনি সার্বজনীন মতাদর্শের প্রবক্তা। কুরআন কোন অঞ্চলের জন্য নয়, সকল দেশের সকল ভাষাভাষী মানুষের জন্য হেদায়েতের উৎস। কুরআন যে অঞ্চলে ও যার উপর নাজিল হয়েছিল সে অঞ্চল ছিল আরব ও সে ব্যক্তি ছিলেন আরবী ভাষী। বুঝাবার সুবিধার্থে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। সূরা ইউসুফের ২নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আমি একে আরবী ভাষায় কুরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো।"

সূরা শুরার ৭নং আয়াতে বলা হয়েছে, "এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও আশপাশের লোকদের সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে যাতে সন্দেহ নেই।" মাআরেফুল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, "মক্কা সকল শহর ও জনপদের মূলভিত্তি। এই মক্কার আশপাশ এর অর্থ আশপাশের আরব দেশসমূহও হতে পারে এবং পূর্ব-পশ্চিম বিশ্বও হতে পারে।" এ থেকে সুস্পষ্ট যে কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হলেও সকল ভাষাভাষীদের হেদায়েতের উৎস। সকলকেই এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে হবে।'

৬. কুরআন জিব্রাইলের মাধ্যমে গোপনে নাজিল করা হয়েছে। এভাবে গোপনে নাজিল করা কি সম্ভব? এ ধরনের প্রশ্নের অবতারণা নিছক বিভ্রান্তি

www.nagorikpathagar.org

ছাড়ানো বৈ কিছুই নয়। মহান রাব্বুল আলামীন সর্বশক্তিমান, তিনি সকল ক্ষমতার আধার। মানুষের পক্ষে টেলিফোনে গোপনে কথা সম্ভব হলে অহী নাজিল অসম্ভব কেন হবে?

৭. কুরআনের অনেক বিধান অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের বিপরীত। কুরআন আল্লাহ প্রেরিত গ্রন্থ হলে আল্লাহ প্রেরিত আন্যান্য আসমানী গ্রন্থের বিপরতি বিধান থাকবে কেন? এ ধরনের প্রশ্নের কোন ভিত্তি নেই। কারণ−

(ক) বর্তমান যে তাওরাত ইঞ্জিল রয়েছে তার সাথে প্রথমে অবতারিত গ্রন্থের কি মিল আছে?

(খ) কুরআনের সাথে অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের যেসব বিধানের ক্ষেত্রে মিল নেই তা মৌলিক ক্ষেত্রে নয়। মূল দ্বীনে বৈসাদৃশ্য নেই। সকল আসমানী গ্রন্থে দ্বীনের বিষয় একই রকম, কিন্তু শরীয়াতে বিভিন্নতা রয়েছে। থাকাটা স্বাভাবিক বটে।

৮. কুরআন যে যুগে অবতীর্ণ হয় তার অনেক পরে সংকলিত হয় তাই এতে সংযোজন ও বিয়োজনের সম্ভাবনা রয়েছে। এ সন্দেহের নিরসনে বিশেষজ্ঞগণ বলেন, এ ধরনের সংশয় ভিত্তিহীন, কেননা রাসূল (সাঃ) এর সময়েই চামড়া, গাছের পাতা প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রাঃ) এর পরামর্শে হযরত আবুবকরের নির্দেশে কুরআন সংকলিত হয়। হযরত ওসমান (রাঃ) এটিকে ছড়িয়ে দেন। কুরআন সংকলন পদ্ধতি ছিল খুবই সতর্কতাপূর্ণ। সাহাবাদের মুখস্থ অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে লিখিত আয়াত মিলিয়ে দেখা হতো। তারপর লিপিবদ্ধ করা হতো। কুরআন নাজিলের পর রাসূল (সাঃ) নিজেই ত্বরিৎতভাবে কণ্ঠস্থ করে নিতেন। সাহাবাদের মধ্যে কুরআন মুখস্থ নিয়ে প্রতিযোগিতা হতো। তাই এ ক্ষেত্রে কিছু বিয়োজনের কোনই সম্ভাবনা নেই।

৯. কুরআন ও হাদীস একই সময়ের। তাই অনেকে সন্দেহ পোষণ করে বলেন, কুরআনের সাথে হাদীস মিলে একাকার হয়ে গেছে। এ ধরনের সন্দেহের কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই। ইমাম নবুবী মুসলিম শরীফের শরাহতে লিখেছেন, "কুরআন যেন হাদীসের সাথে মিলে একাকার হয়ে না যায় এ জন্য রাসূল (সাঃ) প্রথমত হাদীস লিখতে নিষেধ করতেন। এ ধরনের আশংকামুক্ত হওয়ার পরই হাদীস লিখিত হয়। অপরদিকে কুরআনের ভাব, ভাষা ও মান এবং হাদীসের ভাব, ভাষা ও মান দেখে স্পষ্ট যে কুরআন ও হাদীস একই হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। পুরো কুরআনে একই ভাব ও মানের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান।

কুরআন সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ আল কুাআনের শিক্ষা অনুধাবনের ব্যর্থতা ছাড়া কিছু নয়। কুরআন বিশ্ব শান্তিও সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে এ ধরনের উক্তি যে ভিত্তিহীন তা অনেক অমুসলিম পণ্ডিতের উক্তি থেকেই প্রমাণিত। মিঃ গর্ড ফ্রেহগনস বলেছেন, 'কুরআন গরীবের বন্ধু ও কল্যাণকামী ধনীদের বাড়াবাড়িকে কুরআন সর্বক্ষেত্রেই নিন্দা করেছে।' মিঃ ভুপেন্দ্রনাথ বোস বলেছেন, 'তেরশত বছর পরেও কুরআনের শিক্ষাসমূহ এতোই জীবন্ত যে আজও একজন

www.nagorikpathagar.org

ঝাড়ুদার মুসলমান হয়ে যে কোন খান্দানী মুসলিমের সাথে সমতার দাবী করতে পারে।' ডাঃ জাসিদিনে বলেছেন, "পবিত্র কুরআন শুধুমাত্র কতগুলো ধর্মীয় বিধানাবলীর সমষ্টিই নয়। বরং উহাতে এমন এমন সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিধানাবলীও রয়েছে যা গোটা মানব জাতির জন্যই সমান কল্যাণকর।" মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "আমি কুরআনের শিক্ষা সমূহের উপর গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, কুরআন নাজিলকৃত আসমানী কিতাব এবং উহার শিক্ষাসমূহ মানব সত্ত্বার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জ্যশীল।"

উপরোক্ত উক্তিসমূহ কি এ কথা প্রমাণ করে না, কুরআন সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্টের পরিবর্তে তা মজবুত করে? মূলত এ ধরনের অভিযোগের পেছনে দূরভিসন্ধির পাশাপাশি আল কুরআনে বর্ণিত জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞানের দৈন্যতাই রয়েছে। ইসলামের মহান বাণী, কুরআনের অমীয় শিক্ষা মূর্তিপূজক, পিতৃপুরুষের ধর্মের অন্ধ অনুসারী, জাতিগত দাঙ্গায় সদা লিপ্ত রক্তপিপাসু মানুষদের পরিণত করলো সুসভ্য জাতিতে। কুরআনের প্রথম ইংরেজী অনুবাদকারী মিস্টার বাওবেল নিজের লেখা ভূমিকায় কুরআনের প্রশংসায় বলেন "আরবের জাহেল, অসভ্য ও বর্বর জাতিকে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী বানিয়ে ছাড়লো এই কিতাব।" প্রকৃতপক্ষে হিংস্রতা, খুন-খারাবী, দস্যুতা, বিশৃংখলা বন্ধের শিক্ষা নিয়েই আল কুরআন নাজিল হয়েছে। এর ফলে বিশ্বের সর্বত্রই এই কিতাবের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি হতে দেখে পশ্চিমা খৃস্টানগণ ইসলামকে প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম মনে করে ইসলামের ভাবমূর্তি বিকৃত করার জন্য এ গ্রন্থ সম্পর্কে ঈর্ষাপূর্ণ মন্তব্য শুরু করে, তাদের ঘৃণাপূর্ণ অপপ্রচার অনেক মুক্ত ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিগণ বিভ্রান্ত হলেও সত্য অনুসন্ধিৎসু অনেক পন্ডিত নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়।

De lecyoliway তার Islam at the Crassroods গ্রন্থে লিখেছেন, "ইতিহাস আজ এ সত্য প্রমাণ করেছে যে, ধর্মোন্মত মুসলমানদের আক্রমণ এবং বিশ্বব্যাপী তরবারীর জোরে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাহিনী শুধুই ঐতিহাসিকদের মিথ্যাচার। বস্তুত ইতিহাসে যতো আজগুবি অতিকথন রয়েছে তার সঙ্গে সত্যের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এই অপপ্রচার তাদের অন্যতম। কুরআনের শিক্ষার সাথে যে হিংস্রতার কোন বিন্দুমাত্র লেশ নেই বরং এ গ্রন্থ যে ইনসাফ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বাহন সে। প্রসঙ্গে ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারী কলকাতার মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত মিসেস *সরোজিনী নাইডু* এর প্রদত্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "কুরআনুল করীম আদল ও ইনসাফের দলিল, স্বাধীনতার চার্টার ব্যবহারিক জীবনে হক ও ইনসাফের বিধানদানকারী একখানা বিশাল গ্রন্থ।" কুরআনের এ শান্তিপূর্ণ বিধানাবলীর কারণেই ভারতের লালানাজপাড়া রাও বলেছিলেন, "আমি কুরআনের সামাজিক রাজনৈতিক আত্মিক ও নৈতিক বিধানাবলীকে অন্তরের সাথে পছন্দ করি।"

www.nagorikpathagar.org

আল-কুরআনে বর্ণিত জিহাদে বেসামরিক লোকদের প্রতি বাড়াবাড়ি, আগুনে পুড়ানো, যুদ্ধবন্দীদের সাথে অসদাচরণ, অতর্কিত আক্রমণ, নিহতদের লাশের অবমাননা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, নির্যাতন পূর্বক হত্যা, উচ্ছৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য, হিংসাত্মক কার্যকলাপ প্রভৃতির সুযোগ দেয়া হয়নি। তাই আল কুরআনে বর্ণিত যুদ্ধকে হিংস্রতা বলার কোন ভিত্তি নেই। পৃথিবীর বড় বড় চারটি ধর্ম (হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃস্টান) ধর্মের ধর্ম গ্রন্থসমূহে যুদ্ধের বিধিবিধান সংক্রান্ত বর্ণনা রয়েছে। হিন্দু ধর্মও ইহুদী ধর্মে এটা সম্পূর্ণ বৈধ্য, বৌদ্ধ ও খৃষ্ট ধর্ম অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী।

পূর্বেকার আসমানি গ্রন্থসমূহের মধ্যে তাওরাতেও এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আল কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সংশয় ও সন্দেহের অবতারণা রাসূল (সাঃ) এর সময় থেকে অদ্যাবধি চলছে। অতিসাম্প্রতিক তাসলিমা নাসরিন নামক এক মুরতাদ কুরআন সংশোধনের দাবী জানান। পরবর্তীতে এক বিবৃতির মাধ্যমে তিনি শরিয়তি আইন সংশোধনের দাবী জানিয়েছেন। ইতোপূর্বে সালমান রুশদী তার The Satanic Verses বইতে মুহাম্মদ (সাঃ), কুরআনে বর্ণিত মুসলমানদের পিতা ইব্রাহীম (আঃ), রাসূল (সাঃ) এর পবিত্র স্ত্রীগণ, সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কাল্পনিক বানোয়াট চরিত্র হননকারী উক্তি করেছে। অথচ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক অমুসলিম পন্ডিত মুহাম্মদ (সাঃ) ও কুরআন সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করে মন্তব্য করেছেন। কুরআন যে মানুষের রচিত না তার স্বীকৃতি দিয়ে বিখ্যাত পন্ডিত হ্যামর বলেছেন, We hold the Quran to be as surely Mohammads word as the Mohammads hold it to be word of God."

এ থেকে বুঝা যায়, কুরআন ঐশী গ্রন্থ নয় বলে যে প্রচারণা কুরআন নাজিলের সময় করা হয়েছে এবং বর্তমানে চলছে তা ভিত্তিহীন। কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা এটাই প্রমাণ করে এটি বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন এমন এক গ্রন্থ যার কাছে অন্য সব গ্রন্থের শিক্ষা ম্লান। তাই এ গ্রন্থ সম্পর্কে এতো অপপ্রচার, বিভ্রান্তিকর সংশয় ও সন্দেহের অবতারণা করা হচ্ছে। মূলতঃ কুরআনে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নাজিলকৃত তা সন্দেহতীতভাবে প্রমাণিত। এ ধরনের কিতাব যে মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয় তার পক্ষে অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান।

১. আল কুরআন যে আল্লাহ প্রদত্ত ঐশীগ্রন্থ স্বয়ং আল কুরআনের অনেক আয়াত তার প্রমাণ বহন করে–

(ক) সূরা কদরের ১নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আমি একে (আল কুরআনকে) নাজিল করেছি শবে কদরে।"

(খ) সূরা ইয়াসিনের ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে, "কুরআন পরম দয়ালু পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ।"

(গ) সূরা হুদের ১নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আলিফ লাম রা। এটি এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত । অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত এক মহা জ্ঞান, সর্বজ্ঞ সত্ত্বার পক্ষ হতে।

www.nagorikpathagar.org

(ঘ) সূরা বাকারার ১৮৩নং আয়াতে বলা হয়েছে, "রমযান সেই মাস যাতে নাজিল করা হয়েছে কুরআন এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।"

উপরোক্ত আয়াতসমূহে এ কথাই দৃঢ়ভাবে পেশ করা হয়েছে যে মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত।

২. হাদীস শরীফ থেকেও এর অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়-

(ক) এক হাদীসে এসেছে 'ইন্নি উতিতুল কুরআনা' অর্থাৎ আমি কুরআন নিয়ে এসেছি।

(খ) আরেক হাদীসে রয়েছে 'আমি তোমাদের নিকট দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত।'

(গ) অপর হাদীসে রয়েছে "নিশ্চয়ই উত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আর উত্তম জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনীত ব্যবস্থা।'

৩. চৌদ্দশত বছরের দীর্ঘসময়ে কুরআনের অনুরূপ সূরা বা আয়াত রচনার ব্যর্থতা এ কথাই প্রমাণ করে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত।

৪. কুরআনের ভাষাগত ও সাহিত্যিক মান অত্যন্ত উচ্চমানের। ভাষা যেমন স্বচ্ছ এর বাক্য বিন্যাস অত্যন্ত নিখুঁত ও অভিনব। যা মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। কুরআন নাজিলের সময় মক্কা শরীফে ও মদীনাতে তিনবার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল কুরআনের অনুরূপ রচনার জন্য। সুরা ইউনুছের ৪নং রুকুতে উল্লেখ আছে, "তাহারা কি দাবী করে যে কুরআন আপনার বানানো। আপনি বলুন তোমরা যদি তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও তাহলে একটি সূরা অন্তত তৈরী করে নিয়ে এসো। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত যাদের সাহায্য প্রয়োজন বোধ কর সাধ্যমত তাদেরকে ডেকে নাও।' সূরা বাকারা, সূরা হুদ ও বনী ইসরাইলে অনুরূপ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন আরব আনারব কোন দেশের পন্ডিতগণই এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেনি। কুরআনের সাহিত্যিক মান, সুনিপুণ শব্দগঠন প্রণালী, অভিনব বাক্যবিন্যাস আর মর্মস্পর্শী সুর ঝংকার এ কথারই অকাট্য প্রমাণ যে এটি আল্লাহর কিতাব।

৫. পবিত্র কুরআন ও কুরআনের নির্দেশাবলী সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। সকল যুগের মানুষ এ থেকে যুগ সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম। কোন মানুষের সীমিত জ্ঞানে এমন বিশ্বজনীন, সার্বজনীন গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয়।

৬. হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন নিরক্ষর। তার ভদ্রতা, নম্রতা, সত্যবাদীতা ও আমানতদারীতার অসাধারণ গুণ বাল্যকাল থেকেই সর্বমহলে স্বীকৃত। মাত্র সিরিয়ার দু'টি বাণিজ্যিক সফর ছাড়া কোন দেশে ভ্রমণেও যাননি। মক্কা নগরীতেই অবস্থান করেছেন। লেখনী বা কোন পুস্তক স্পর্শ করেছেন দীর্ঘ চল্লিশ বছরে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঠিক চল্লিশ বছরে মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়ে তার মুখ থেকে যে বাণী নিঃসৃত হতে লাগলো তা কিভাবে সম্ভব হলো? আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ না পেলে তা সম্ভব হতো না।

www.nagorikpathagar.org

৭. মানুষের অন্তর্নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কে যেসব সংবাদ দেয়া হয়েছে পরে সংশ্লিষ্ট লোকদের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে এসব কথাই সত্য। এ কাজ আল্লাহর পক্ষ থেকে না হলে কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

৮. হযরত আদম ও হাওয়ার বৃত্তান্ত, হযরত নূহের ঘটনা, হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসমাইল ও হযরত ইয়াকুবের কাহিনী, নমরুদ ফেরাউনের প্রসঙ্গ, হযরত ইউসূফ, মূসা, আদ, সামুদ, যুলকারনাইন, আসহাবে উখদুদ, হারুত-মারুত, জালুত প্রভৃতি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। যদি এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ না হয় তাহলে রাসূলের (সাঃ) জন্মের প্রায় দু'হাজার বছর আগের হযরত ইউসুফের জীবনে যে বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে রাসূল (সাঃ কিভাবে নিখুঁত করে বর্ণনা করেছেন, আর ওয়াহী ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে এমন নিখুঁতভাবে জানা সম্ভব নয়। সূরা ইউছুফে আছে "আর এসব হল অজানা ও অজ্ঞাত ঘটনাবলী যা (হে নবী) তোমাকে আমি ওহীর মাধ্যমে অবগত করাচ্ছি। অথচ ইউছুফের ভায়েরা যখন ষড়যন্ত্র করছিলো এবং তাদের পরিকল্পনা ঠিক করে নিয়েছিল তখন তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে না। বাস্তবপক্ষে যদি ওহী মারফত তিনি না জানতেন তাহলে প্রায় এক হাজার আটশ' বছর পূর্বেকার আফ্রিকার মিসর দেশে হযরত মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের বিচিত্র ঘটনাবলী কিভাবে তিনি জানলেন?

৯. ভবিষ্যত ঘটনাবলী সম্পর্কে নির্ভুল সংবাদ দান, কুরআন কিছু গায়েবী সংবাদ এবং ভবিষ্যতে ঘটবে এমন অনেক সংবাদ দিয়েছে যা হুবহু সংঘটিত হয়েছে। কুরআনে রোম ও পারস্য যুদ্ধে প্রথমত পারস্যবাসী জয়লাভের সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং পূর্ণরূপ দশ বছর যেতে না যেতে রোম পারস্যকে পরাজিত করতে মক্কার সর্দারগণ এ ভবিষ্যতবাণীর যথার্থতা নিয়ে হযরত আবু বকরের সাথে বাজি ধরলো। ৬১৫ খৃষ্টাব্দে রাসূলের হিজরাতের সাত বছর পূর্বে পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খসরুর সৈন্য বাহিনীর হাতে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বাহিনী ভীষণভাবে পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে রোম সম্রাট তার গোটা এশিয়ান এলাকাই হারিয়ে কনষ্টান্টিনোপলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।"

১০. উদ্ভিদ বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সকল দিকের জ্ঞানের সাগর আল কুরআনুল কারীম। অন্য কোন কিতাবে জ্ঞানের নানাবিধ শাখা-প্রশাখার এ ধরনের বর্ণনা নেই। সংক্ষিপ্ত ও সীমিত শব্দ সম্ভারের মধ্যে এতো বিষয়বস্তুর সমাবেশ, রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের নির্ভুল বিধান বর্ণনা একজন নিরক্ষর (উম্মী) ব্যক্তির পক্ষে অহী ছাড়া সম্ভব নয়।

১১. কুরআনের অপূর্ব সংরক্ষণ ব্যবস্থা ঃ পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থ এতো দীর্ঘকাল পর পরিবর্তন, বিকৃতিকরণ মুক্ত পাওয়া যায় না। সুদীর্ঘ ১৪ শত বছরে এতে কোন শব্দ সংযোজন বা বিয়োজন হয়নি। কেননা কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহপাক গ্রহণ করেছেন। সূরা হিজরে উল্লেখ আছে, 'নিশ্চয়ই কুরআন আমিই নাজিল করেছি আর অবশ্যই উহার হেফাজতের দায়িত্ব আমারই।' কুরআন ছাড়া অন্য কোন আসমানি গ্রন্থ আসলরূপে পাওয়া দুষ্কর।

www.nagorikpathagar.org

১২. বিশ্বলোক ও উর্ধজগত সম্পর্কে যে নির্ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে বিজ্ঞানের উন্নতির বিভিন্ন পর্যায়ে উহার বাস্তবতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন–

(ক) মধ্যাকর্ষণ থিওরী (Law of grivetion) ১৬৬৫ খৃস্টাব্দে নিউটন আবিষ্কার করেন অথচ এর অনেক পূর্বে কুরআন উল্লেখ করেছে "এবং আল্লাহর তায়ালার মহা নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও একটি যে উর্ধলোক ও ভূমণ্ডল তারই আমর দ্বারা (মহাশূন্যে) প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

(খ) ফরাসী পদার্থ বিজ্ঞানী দ্যাবগলি ১৯১৫ সালে বিশ্বের সর্বত্রই দ্বৈত ও জোড়া সৃষ্টির তথ্য প্রকাশের পূর্বে আল কুরআনে বলা হয়েছে এবং আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আম্মা হয়াতাছালুল রুকু নং)।

(গ) বিশ্বের সবকিছুই অবিরতভাবে গতিশীল। গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন কর্তৃক তথ্য প্রদানের পূর্বেই কুরআন বলা হয়েছে সূর্য ও চন্দ্র তাঁরই সৃষ্টি আর সকলেই মহাশূন্যে সাঁতার কাটছে।

(ঘ) বিশ্বের নৈপুণ্যময় সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট বলেছেন– আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না যে জগতেকে নিয়ে সৃষ্টিকর্তা পাশা খেলছেন। সূরায়ে দোখানে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, আমি আকাশ ও তৃণমূল এবং তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু খেলাস্থলে সৃষ্টি করিনি।

১৩. মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মৌলিক ব্যবস্থা দান। পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্যার ডায়মন্ড এ প্রসঙ্গে লিখেছেন 'কুরআনের বিধানাবলী শাহানশাহ থেকে আরম্ভ করে পর্ণ কুটিরের অধিবাসী পর্যন্ত সকলের জন্যই সমান এটা মানুষের রচিত গ্রন্থ হলে এ ধরনের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিধি-বিধান থাকতো না।

মোদ্দা কথা, কুরআন মহান রাব্বুল আলামীন কর্তৃক জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ। কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যেক যুগের পন্ডিতদের বিবেক হয়রান করে দেয় কুরআনের বিস্ময়কারী প্রভাবের কারণে অনেক অমুসলিম পণ্ডিত (যাদের বুদ্ধি বিবেক বিদ্বেষের কালিমায় নষ্ট হয়নি) স্বীকার করছেন এ গ্রন্থ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রচিত নয়। প্রখ্যাত মনীষী কোন্ট হেনরী বলেছেন, 'কুরআনের অধ্যয়ন বিবেক হয়রান হয়ে যায় যে, একজন অশিক্ষিত লোকের মুখ হতে এ ধরনের কালাম কি করে বের হয়।' কুরআন ঐশীগ্রন্থ হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ দিবালোকে সূর্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করার নামান্তর। এটা যে ঐশীগ্রন্থ এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন স্থান নেই।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন ঃ বর্তমান প্রেক্ষিত

যেসব নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান দ্বারা সজ্ঞান, প্রাপ্ত বয়স্কদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করার পন্থা জানা যায়, মানুষের বিবাদ ও বিভিন্ন ঘটনার মীমাংসা করা হয় সেসব বিধি-বিধানকেই আইন বলা হয়। অস্টিনের মতে, The law is the command of the Sovereignty 'সার্বভৌমের আদেশই আইন' অস্টিনের সংজ্ঞাকে একটু সংশোধন করে হল্যান্ড বলেন– A general rule of external human actions enforced by a Sovereign political authority." বাহ্যিক ব্যাপারে মানুষের কর্মের যে সাধারণ নিয়মগুলো সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা বলবৎ করা হয় তাহাই আইন। একথা সকলের নিকট স্পষ্ট যে, এই আইন প্রণয়নের উৎস যদি আল্লাহর কিতাবও রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ পাকই হয়ে থাকেন তাহলে উহাকে শরীয়ে এলাহী বা আল্লাহর আইন বলা হয়। উহার উৎস যদি মানুষ হয় ব্যষ্টি বা সমষ্টি, তবে উহাকে মানুষের আইন বলা হয়।

এখন মুল্যায়ন করা দরকার, ইসলামী আইন বলতে কি বুঝায়? যদি শুধু কুরআনে বর্ণিত আইনকেই ইসলামী আইন বলা হয় তাহলে যেসব সমস্যার সমাধান কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত নেই, সেসব সমস্যার সমাধানে কি মানব রচিত আইনের দ্বারস্থ হতে হবে? যদি তাই হয় তাহলে ইসলামী আইন কি অপূর্ণাঙ্গ? এ কথার জবাবে বলা যায়, ইসলামী আইন ব্যাপক, গতিশীল, সার্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ। কুরআন ইসলামী আইনের প্রধান ও মৌলিক উৎস। কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদানে রাসূল (সাঃ) যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন, সেসব ইসলামী আইনের অন্তর্ভূক্ত। এই কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে বিভিন্ন যুগে মুজতাহিদ আলেমগণ যুগ যুগে তাদের যুগের উপযোগী আইন তৈরী করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, যদি মুসলিম চিন্তাবিদগণ আল্লাহর আইনের মৌলিক নির্দেশের বিপরীতে কোনো বিধি-বিধান প্রণয়ন করেন, তাহলে উহা ইসলামী আইনের আওতাভূক্ত না হয়ে মানুষের আইন হিসেবেই চিহ্নিত হবে। এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, বর্তমান সময়েও যে কোনো সমস্যার সমাধান ইসলামী আইনের মাধ্যমেই সম্ভব। এ জন্য মানবরচিত আইনের মুখোপেক্ষী আদৌ হতে হবে না। ইজতিহাদ সকল প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম।

এখন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, বহু শতাব্দী পুরনো ইসলামী আইন আধুনিক যুগ সমস্যা ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে উহা কি যথেষ্ট? একটি বিশেষ সময়ের আইনকে সর্বকালের জন্য গ্রহণযোগ্য মনে করা কি যুক্তসঙ্গত? আধুনিক বিশ্বে এ প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী আইনের প্রকৃতি ও গতিশীলতা সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রেক্ষিতে। চৌদ্দশত বছর আগে ইসলামী আইনের যে মূলনীতি দেয়া হয়েছিলো তার আলোকে তখন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, পরবর্তীতে মুসলমানগণ

www.nagorikpathagar.org

যতো রাষ্ট্র কায়েম করেছে সবই ইসলামী আইনের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়েছে। কোনো সময়েও উহা মানব প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হয়নি। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ দেশেও ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনসহ ইসলামী আইনের বিভিন্ন দিক কার্যকরী ছিলো।

এদেশে ইংরেজদের কর্তৃত্ব লাভের পর আস্তে আস্তে ইসলামী আইন পাল্টে দিয়ে নিজেদের আইন প্রবর্তন করে। এভাবে উনবিংশ শতকে এসে ইসলামী আইন সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যায়। এ কারণেই বর্তমানে এ সম্পর্কে সংশয় বা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বহু পুরনো ইসলামী আইনের মাধ্যমে বর্তমান যুগের প্রয়োজন মিটানো কি সম্ভব? মূলতঃ সূর্য বহু পুরনো হলেও তার কিরণ বর্তমান যুগেও কার্যকরী, ভবিষ্যতেও প্রয়োজন পূরণে ঠিক থাকবে। তেমনিভাবে ইসলামী আইন পুরাতন হলেও অতীতে বহু শতাব্দী ধরে মানব প্রয়োজনে যেমনি যথেষ্ট ছিলো, বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও অনুরূপভাবে সক্ষম হবে। কেননা ইসলামী আইনের যেসব বিধান স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় যেমন– মদ, জুয়া, সুদ হারাম হওয়া প্রভৃতি স্থায়ী বিধানাবলী সম্পর্কে এমন মৌলিক বিধি বিদ্যমান। যথা প্রত্যেক নেশা করা বস্তু হারাম যার ভিত্তিতে কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত না থাকলেও আধুনিক যুগেও অনেক বস্তুকে ইসলামী আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা যায়। অপরদিকে যুগ সমস্যা সমাধানের জন্য ইজতিহাদ ও কিয়াস ইস্তেহসান (অর্থাৎ জায়েয কার্যক্রমের অসীম পরিসরে প্রয়োজন মতো এমন আইন তৈরী করা যা ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার সাথে সামঞ্জস্যশীল) এর অবকাশ থাকায় ইসলামী আইন গতিশীলতা লাভ করছে। এ জন্য ইসলামী আইন একটি বিশেষ যুগের হলেও সর্বকালে উহা উপযোগী করা যায় আধুনিক যুগের যে কোনো ধরনের সমস্যার সমাধান ইসলামী আইনের মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে করা সম্ভব।

বর্তমান সময়ে আরেকটি বিরাট প্রশ্ন ইসলামী দণ্ডবিধি আধুনিক সভ্য জগতে কি কার্যকরী করা যায়? বেত্রাঘাত, হাতকাটা, পাথর মেরে হত্যা এটা কি বর্বরতা নয়? যেসব ব্যক্তিগণ আধুনিক সভ্যতার শ্লোগান দিয়ে এসব প্রশ্ন করেন তারা মানুষের হাত কাটেন না বটে এটম বোমা নিক্ষেপ করে গোটা মানব জাতিকে ধ্বংস করেন। তারা বেত্রাঘাত করেন না। তবে জীবন্ত মানুষকে জবাই করে মৃত লাশ থেকে চর্বি বের করে সাবান তৈরী করে অর্থোপার্জন বৈধ মনে করেন। এটাই তাদের সভ্যতার পরিচয়, অথচ একথা স্পষ্ট যে, একজন ব্যক্তি চুরি করলেই সাথে সাথে হাত কেটে দেয়া ইসলামের বিধান নহে। এ বিধান তখন কার্যকরী হবে যখন বিত্তবানদের থেকে যাকাত আদায় করে দুস্থদের পুনর্বাসন করা হবে। রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল বিপদগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য সদা উন্মুক্ত থাকবে। নৈতিক সংশোধনের ব্যবস্থা করার পরও যখন কোনো ব্যক্তি অভাবের পরিবর্তে স্বভাবের দোষে চুরি করবে তখন শুধু এ বিধান কার্যকরী হবে। রাসূল (সাঃ)-এর সময়ে একজন মহিলার চুরির দায়ে হাতকাটার পর চুরির আর কোনো ঘটনাই ঘটেনি। হযরত আবু বকরের খিলাফত যুগে হযরত ওমর যখন মদীনার কাজী ছিলেন এক

www.nagorikpathagar.org

বছরে তার কাছে একটি মোকদ্দমাও বিচারের জন্য হাজির করা হয়নি। ইহা ইসলামী আইন কার্যকরী থাকার সুফল নয় কি?

অপরদিকে এক রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৭২-১৯৭৫ পর্যন্ত দেশে ১৭,২৯৬ ডাকাতি, ১৪,১৮৭ রাহাজানী, ৫৪,৩৯৭ সিঁধেল চুরি, ৬৩,৪৭০ চুরি সংঘটিত হয়েছিলো। '৯৬ সালে থানায় ধর্ষণসহ নথিভুক্ত অপরাধ সংখ্যা ৯৩ হাজার ৩১০টি। '৯৭ সালে এ সংখ্যা ১ লাখ ২ হাজার ১৬১টি। পুলিশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী '৯৭ সালে এ ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধ রেকর্ড হয়েছে ৭,৮৪১টি। সাম্প্রতিক কালে শিশু তানিয়া, গোপালগঞ্জের লিপি, চৌমুহানির রেশমা, ঢাকার মৌসুমী, রংপুরে মর্জিনা, কুষ্টিয়ায় রুমা, খুলনায় জ্যোৎস্নাসহ প্রতিনিয়তই ৩ বছরের শিশু থেকে ৮০ বছরের বৃদ্ধা ধর্ষণের রির্পোট প্রকাশিত হয়। ভিক্ষুকও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। আর ধর্ষণকারীদের মধ্যে রয়েছে খোদ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিকৃত মস্তিস্কের কিছু ব্যক্তি। সরিষায় যদি ভূত থাকে ভূত তাড়াবে কে? এ কথাটি আজ সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছে। এটার মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতা দূর করা সম্ভব হবে না। গত ৩০ মার্চ ১৯৮৭ ইং দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যায় বৃটেনে প্রতি এক লাখ লোকের মধ্যে ৯৫.৩ জন, লুক্সেমবার্গে ৮৮.৯ জন অপরাধের কারণে কারাবন্দী। এসবকি প্রচলিত দণ্ডবিধি কার্যকরী থাকার ফলে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির নজীর নয়? এ আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত, সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকরী করাই সময়ের দাবী, কারণ ইসলামী আইনে চোরের শাস্তি জেলখাটা এ শাস্তি থেকে অনেক সময় বিশেষ তদ্বিরে ক্ষমা পাওয়া যায়। এতে চোর-ডাকাতির ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে বের হয়, ফলে চুরি-ডাকাতি বৃদ্ধি পায়। ইসলামী আইনে জেনার শাস্তি রজম বা অবস্থাভেদে ১০০ চাবুকের আঘাত। এ শাস্তিলঘু করা যায় না। এতে জেনা-ব্যভিচার দূর হয়। প্রচলিত দণ্ড আইনে জেনা উভয়ের সম্মতিতে হলে বেকসুর খালাস। পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স থাকলেও এটা কোনো অপরাধই নয়, এতে দিন দিন ব্যাভিচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ১৮ জুন ১৯৮৭ইং দৈনিক বাংলা পত্রিকা তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছে, 'বিগত ১৬ বছরে বাংলাদেশে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা ৩৫ হাজারেরও বেশী।' উপরোক্ত তথ্য এ কথারই সাক্ষ্য যে, প্রচলিত আইন সমাজে অপরাধ প্রবণতা রোধে ব্যর্থ। একমাত্র ইসলামী আইনই সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি।

ইসলামী ফিকহী বিষয়ে ফকীহদের অনেক মত, তাই ইসলামী আইনের কথা উঠলে অনেকে প্রশ্ন করেন, ফকীহদের কোন মতের ভিত্তিতে আইন প্রণীত হবে। মূলতঃ একাধিক ফিকহী মত ইসলমী আইন প্রবর্তনে সমস্যা নয়, কুরআন ও সুন্নাহ এর ভিত্তিতে সংসদ Law করবে। অন্যান্য ফিকহী মত Reference হিসেবে দেখবে। উপমহাদেশের একটি মুসলিম দেশে এ ধরনের নজীর আছে। ইসলামী আইন বস্তাবায়নের কথা বললে এক শ্রেণীর ব্যক্তিগণ প্রশ্ন করেন অমুসলমান সংখ্যালঘুগণ কি মুসলমানদের ধর্মীয় আইন মেনে চলতে হবে?

www.nagorikpathagar.org

অন্যথায় তারা কিভাবে বসবাস করবে? একথা সর্বজনবিদিত যে 'অমুসলমানগণের স্রষ্টা যিনি তিনিই মুসলমানদের রব।' আল্লাহর দেয়া আলো-বাতাস-পানি মুসলিম-অমুসলিম সমভাবে সকলের জন্য উপকারী। তেমনিভাবে আল্লাহর দেয়া আইন সকলের জন্যই কল্যাণকর।

অপরদিকে একথা যুক্তিযুক্ত যে, যে কোনো দেশের আইন সেদেশের অধিকাংশ জনগণের আবেগ, অনুভূতি ও বিশ্বাসকে লালন করেই হওয়া উচিত। বাংলাদেশে যেহেতু মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আইন চালু থাকবে এটাই ইনসাফের কথা। তবে অমুসলমানদের ব্যক্তিগত বিষয়ে তাদের ধর্মীয় আইন মেনে চলার সম্পূর্ণ সুযোগ থাকবে। তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস লালন ও পালন করার অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত থাকবে। অমুসলিমদেরকে ধর্মীয় বিষয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় আইন মানার জন্য আদৌ বাধ্য করার অবকাশ ইসলামী আইনে নেই। তবে ইসলামী আইনের সামাজিক দিকগুলো সমভাবেই প্রযোজ্য হওয়া যুক্তিযুক্ত। যেমন মদ্যপান নিষিদ্ধ থাকা সকলের জন্যই কল্যাণকর।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে একথা প্রমানিত যে, বর্তমান প্রেক্ষিতেও ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব, ইসলামী আইনের প্রয়োগ সর্বকালের জন্যই কল্যাণকর, এখন চিন্তা করা দরকার আমাদের দেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন, আমি এ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি।

(১) ইসলামী আইন প্রবর্তনোপযোগী পরিবেশ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করতে হবে। ইসলাম মদপান নিষিদ্ধ ঘোষণার পূর্বে ৩টি ধাপে নিষিদ্ধ করার পরিবেশ তৈরী করেছে। অতএব আইন প্রবর্তনের পূর্বে তা যেনো জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে চলতে পারে সে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা চালাতে হবে এবং ইহসানের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে আইন কার্যকরী করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

(২) ইসলামী আইন সার্বজনীন নহে এ ভুল ধারণা অপনোদন করতে হবে। যারা ইসলামী আইন শব্দটি শুনলে আঁৎকে উঠেন তাদের কাছে উপকারিতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার করতে হবে।

(৩) রাষ্ট্রের মৌলিক আইন হতে হবে আল্লাহ যে শরীয়ত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দিয়েছেন তার আলোকে, শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক আইন বদলাতে হবে। ভবিষ্যতে শরীয়ত বিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে না।

(৪) আইন শিক্ষার সংস্কার সাধন করতে হবে। আইন বিষয়ের পাঠ্যক্রম তৈরী করতে হবে। যাতে করে আইন বিষয়ে যারা অধ্যয়ন করছে তাদের নিকট ইসলামী আইনের সকল দিক সুস্পষ্ট হয়।

(৫) ইসলামী আইন একাডেমী স্থাপন করতে হবে। আধুনিক যুগের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার কারণে অনেক ফিকহী মাছায়েল নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন। তাই এ একাডেমী যুগ সমস্যার সমাধানে যুগোপযোগী বিধান ঢেলে সাজাবে।

www.nagorikpathagar.org

(৬) বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে হবে। খুনের মামলার রায় ত্বরিৎ করতে হবে। ২/১ বছর রায় প্রদানে বিলম্বের অবকাশ রহিত করতে হবে। জেলকোড সংস্কার করে জেলখানাকে নৈতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে।

(৭) কোর্ট ফি রহিত করাই বাঞ্চনীয় যাতে গরীব জনগণ বিচার প্রার্থী হওয়ার সুযোগ নিশ্চিত হয়। কোর্টের খরচ পরিচালনার জন্য মিথ্য মামলাকারী ও মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীর জরিমানা করা যেতে পারে। এ ছাড়াও প্রয়োজনীয় অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বরাদ্দ করতে হবে।

(৮) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে আলাদা করতে হবে। বিচারকদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে। বিচারকদের বেতন ভাতা বাস্তবতার নিরিখে বৃদ্ধি করতে হবে।

(৯) আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আরও পুনর্গঠন করতে হবে। অদোষী ব্যক্তিকে হয়রানি যেনো করা না হয় এর দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। দুষ্টের দমনে তাদের ভুমিকা আরও বলিষ্ঠ হতে হবে।

(১০) পর্যায়ক্রমে ইসলামী আইন প্রবর্তনের পদক্ষেপ নিতে হবে। কোনো আইন হঠাৎ বাস্তবায়ন করা যায় না আবার আকস্মিকভাবে এক ঘোষণায় তুলে দেয়াও কঠিন। তাই ইসলামী আইন ধীরে ধীরে প্রবর্তনের জন্য 'ইসলামী আইন প্রবর্তন কমিশন' গঠন করা যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী আইন জনগনের জন্য সবচেয়ে বেশী কল্যাণকর। প্রচলিত আইনে অপরাধ প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে শিশু ধর্ষণসহ অপরাধ প্রবণতা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে বর্তমান প্রচলিত আইনের অসারতা প্রমাণ করে। এমতাবস্থায় ইসলামী আইন কার্যকরী করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণই সময়ের দাবী। ইসলামী আইন ছাড়া শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধান যতো নতুন নতুন আইন বা অধ্যাদেশ জারী করা হোক না কেনো তার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্রঃ

১. ইসলামী আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস- আবদুল ওহাব খাল্লাফ।

২. ইসলামী আইন কি ও কেনো- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

৩. ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম- সাইয়েদ কুতুব।

৪. ইসলামী আইনের সংকলন- তানযীলুর রহমান।

৫. ইসলামী দণ্ডবিধি- খন্দকার আবুল খায়ের।

www.nagorikpathagar.org

ধর্ম অবমাননা ঃ প্রচলিত ও ইসলামী আইন

ধর্ম শব্দটি সংস্কৃত ধৃ শব্দ হতে উৎপন্ন। ধৃ মানে ধারণ করা সুতরাং ধর্ম মানে যা ধারনা করে পোষণ করে, Religion ইংরেজীতে প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত, যার তাৎপর্য বলা হয়েছে– Human Recognition of a personal, God entited to oledies any system of faith and warshig অনেকে মনে করেন, Religion is private relation between man and god. অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে এ ধারনাটি বর্তমানে যথার্থ হলেও ধর্মকে এভাবে ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ করা ইসলামী দৃষ্টিভংগীর বিপরীত, ইসলামে ধর্মের পরিভাষা হিসেবে দ্বীন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ জীবন ব্যবস্থা, সংবিধান, আনুগত্য, কর্মফল, রাজ্য, প্রতিফল এ সমুদয় অর্থের সমন্বিত রূপই হচ্ছে দ্বীন। অতএব ইসলামী কনসেপ্ট অনুযায়ী দ্বীনকে ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ রাখার অবকাশ নেই। দ্বীন মানে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, এ জীবন ব্যবস্থার আংশিক অনুসরণ নয়, পূর্ণাঙ্গ অনুকরনই আবশ্যক। আল্লাহর বাণী 'উদখুলূ ফিসছিলমে কাফফাতান' (ইসলামে পরিপূর্ণ দাখিল হও)। ইসলাম গ্রহনের ক্ষেত্রে জবর দস্তির সুযোগ নেই। 'লা ইকরাহা ফিদ্বীনে' তারই প্রমান। কিন্তু দ্বীন গ্রহনের পর তার পূর্ণাঙ্গ অনুসরন কর্তব্য।

ইসলামে বুদ্ধি বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্ম বিশ্বাস পোষন ও স্বীয় ধর্মানুযায়ী উপাসনার অধিকার স্বীকৃত। আইনের আওতায় নিজের মত চিন্তাধারা ও বিশ্বাস প্রকাশেও বিধিসম্মত সমালোচনার অধিকার সবার রয়েছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে কারো ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবমাননা করা ও কোন কিছু প্রকাশ করা যাবে না। তাদের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষ্যাপানো বা উত্তেজিত করা যাবে না। অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের উপাস্যদের গালি দেয়া থেকে বিরত থাকতে আল কুরআনে নির্দেশ রয়েছে, 'সূরা আল আন আমের ১০৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে– 'তোমরা তাদের মন্দ বলোনা, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে, তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহকে মন্দ বলবে এমনি ভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি' ইসলাম এত সুন্দর বিধান দিয়ে ধর্ম, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে অশোভন উক্তি, কটাক্ষ করা, মন্তব্য করার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ এক শ্রেণীর ধর্ম বিদ্বেষী ব্যক্তিরা মুক্ত চিন্তা বা বাকস্বাধীনতার নামে ধর্মকে 'প্রগতির শত্রু,' বর্বর যুগের চিন্তার ফসল, মানুষের জন্য 'আফীম' বলে প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে অমুসলিম শুধু নহে তথা কথিত বুদ্ধিবিকৃত অনেক মুসলিম ব্যক্তিও পরিচিতি লাভ, কিংবা অর্থোপার্জন বা বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নের অপচেষ্টায় লিপ্ত। ৯ মে ভারতের দৈনিক স্টেটম্যান পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাতকারে তাসলিমা নাসরিন নামক এক কুলাঙ্গার কুরআন প্রসংগে বলেছে– The Quran is a written book, I am not in Favour changes. It serves no purpose the Quran should be revised throughly. পরবর্তীতে ১১ মে আরেক বিবৃতির মাধ্যমে শরীয়তী আইনের সংশোধনের দাবী জানায়। তিনি ১৯৯৩ সালে বোম্বে থেকে

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশিত ফ্যাশন ম্যাগাজিনে 'ওটশশহ' নভেম্বর সংখ্যায় আত্মকাহিনীতে লিখেছেন- 'আমি কোরআন বিশ্বাস করিনা, নামাজ পড়িনা, কোরআনে ভুল রয়েছে, আল্লাহ একজন মিথ্যাবাদী। কারণ কোরআনে আছে সূর্য পৃথিবীর চারদিক ঘুরছে। আমি ইসলামকে আঘাত করি কারণ ইসলাম নারী স্বাধীনতা দেয় না, আমি অবাধ যৌন সংগমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি তার জন্য বিয়ে করার দরকার নেই' তার এসব বক্তৃতা বিবৃতির কারণে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হয়। সে সময়েও সে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার জন্য অনুতপ্ত না হয়ে উল্টো সাক্ষাতকার প্রদান করেন। জার্মানীর ডার স্পইজেল সাময়িকীর সাংবাদিক মিস্ ব্রিজিত শোয়ার্জ কর্তৃক গৃহীত ১৩ জুন প্রকাশিত সাক্ষাতকারে বলেন 'কোরআন আমাদের ন্যায় বিচারের ভিত্তি হতে পারে না, চৌদ্দশ বছর আগে বর্বরতার অবসান ঘটাতে হয়ত তার প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল, কিন্তু এখন আমরা আধুনিক কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বাস করি, কোরআন এখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। *বহু ক্ষেত্রে কোরআনে* ভুল রয়েছে' (ইনকিলাব ২৭ জুন) তিনি নিজকে নাস্তিক স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন, "ধর্মের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যবস্থা ভাল হতে পারে না। আধুনিক সভ্য সমাজে ধর্মীয় গ্রন্থের আর কোন প্রয়োজন নেই।"

গত ১২ মে দৈনিক জনকণ্ঠে সুরা ত্বীনের বিকৃত অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে সালমান রুশদী নামক এক মুরতাদ The Satanic Verses বইতে রাসুল (দঃ), মহাগ্রন্থ আল কুরআন প্রসঙ্গ কাল্পনিক মন্তব্য করে লিখেছে The Prophet Mohammad could not tell the difference between the angel and the devil. The mother of muslims are like prostitute in a brathal. Quran has satanic verses তার এ ধরনের উক্তিতে বিশ্ব মুসলিম ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। ইরানের ধর্মীয় নেতা মরহুম আয়াতুল্লাহ খোমেনী মৃত্যু দন্ডের ঘোষণা দেন।

অতি সাম্প্রতিক মানবাধিকার ও ইসলাম নামক একটি গ্রন্থ রিফর্ম নামক একটি সংস্থা প্রকাশ করে এতে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কে দুশ্চরিত্র ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে 'ধর্ম হিসেবে ইসলাম সহিংসতা, ধর্ষন ও নির্যাতনের মাধ্যমেই প্রচারিত হয়েছে- 'যতদিন ইসলামের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন শান্তি বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্ভব নয়' ইতিপূর্বে কবি শামছুর রাহমান আজানকে অলিতে গলিতে বেশ্যার খদ্দের খোঁজার আহবানের সাথে তুলনা করে লিখেছেন। এবং মুয়াজ্জিনের ধ্বনি যেন ক্যানভাসের একটানা অলজ্জিত বেশ্যাবৃত্তি, অলিতে গলিতে কারা যেন বাস্তবিক কুলকুটি করে ফেলে দেয় স্বপ্ন, স্মৃতি মেদমজ্জা সুন্দরের।'

তিনি মসজিদকে উলঙ্গ নারীদেহের সাথে তুলনা করে লিখেছেন- 'নিপোশাক তোমার শরীর জ্যোৎস্না ধোয়া মসজিদের মতো' তিনি তার আরো বোকা মানুষ কলামে নিজের বসের তোষামোদের জন্য নিজ স্ত্রীকে প্রয়োজনে বসের বিছানায় পাঠাতে বলেছেন, ডঃ আহমদ শরীফ সাপ্তাহিক বিচিত্রা ১৫ ফেব্রুয়ারী ৮৫ সংখ্যায় লিখেছেন 'বিবাহ পূর্বক দৈহিক সম্পর্ক ও চুমু খাওয়াতে আমার কোন আপত্তি নেই, মদ্যপান ভাল

www.nagorikpathagar.org

অভ্যাস, এতে খারাপ কিছু নেই আমি পরলোকে বিশ্বাস করিনা।' শিল্পী কামরুল হাসান বলেছিলেন 'মক্কা যদি কেবলা হতে পারে তাহলে মস্কো হতে পারবেনা কেন, বেহেশত যদি থেকেই থাকে তার জন্য দুর্বোধ্য ভাষায় কালেমা পড়ার প্রয়োজন নাই।'

উল্লেখিত বিবরণ হচ্ছে তথাকথিত ধর্মদ্রোহী বুদ্ধিজীবীদের বক্তৃতা বিবৃতির কিঞ্চিত উদাহরন। এসব লেখনীতে যে ভাবধারা প্রকাশিক হয়েছে তা থেকে ফুটে উঠেছে।

ইসলাম, কুরআন, নবী ও রাসূল প্রসংগে এ ধরনের লিখনী কথিত মুক্ত চিন্তা ও বাক স্বাধীনতার ফসল। তাদের এ ধরনের মন্তব্য বিবৃতির বিরোধিতাকে মুক্ত বুদ্ধি চর্চায় অন্তরায় হিসেবে তাঁরা আখ্যায়িত করেন। এ ধরনের লেখনীর জন্য তাদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করলে তাঁরা আলেম সমাজকে ফতোয়াবাজ হিসেবে অভিহিত করে উল্টো বিবৃতি দিয়ে তাদের শাস্তি দাবী করেন। এখন চিন্তা করা প্রয়োজন বাক স্বাধীনতার নামে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার অধিকার আছে কি? কোন ব্যক্তি মুসলিম নাম ধারন করে কুরআন, ইসলাম ও ধর্ম সম্পর্কে কটুক্তি কি অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হবে না? ধর্ম অবমাননার জন্য বর্তমান প্রচলিত আইন শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কিনা? ইসলামী আইনে এ ধরনের অপরাধের শাস্তি কি? বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ (১) ধারানুযায়ী (Freedom of thought and Concience is guaranteed) Every citizen has the right to profess practice or propagata any religion.প্রত্যেক নাগরিকের যেকোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে।

কিন্তু চিন্তার স্বাধীনতার নামে ধর্মের বিরুদ্ধে লিখার অধিকার নেই। গত ২৪ জুন ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এক সভায় বলেছে- 'সংবাদ ও সাময়িকীগুলো স্বাধীন বলে একজন সাংবাদিক কিংবা লেখক যা ইচ্ছে তাই লিখবেন এমনটি হতে পারে না। সাংবাদিক তার স্বাধীনতার নামে কেউ যেমন দেশের সংবিধান লংঘন করতে পারেনা, তেমনি পারেনা দেশের স্বাধীনতা, গনতন্ত্র এবং ধর্মের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে (২৫ জুন সংগ্রাম)। আন্তর্জাতিক লেখক সংস্থার বাংলাদেশ শাখার পক্ষ থেকে এ প্রসংগে পত্রিকায় বিবৃতি দেয়া হয়েছে 'বাক স্বাধীনতার নামে কোন লেখক মিথ্যা ও ভ্রান্তিকে গ্রহন করতে পারেন না, ধর্ম ও ধর্মপ্রচারকদের বিরুদ্ধে অশ্লীল কটুক্তি করতে পারেনা না, কেননা এর ফলে সরল বিশ্বাসী জনসাধারনের মনে একটি বিক্ষোভের সঞ্চার হতে পারে। ভবিষ্যত প্রজন্ম বিভ্রান্ত হতে পারে সমাজের মধ্যে রক্তপাত ও বিভাজন সৃষ্টি হতে পারে। এটা মানবতা বিরোধী অপরাধ'। এ থেকে স্পষ্ট হল মুক্ত বুদ্ধি চর্চা কিংবা বাক স্বাধীনতা বা লেখকের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকারের নামে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার অধিকার নেই; বাংলাদেশ ফৌজদারী দন্ডবিধি অনুসারে ও এটা দন্ডযোগ্য অপরাধ। দন্ডবিধির ১৯৫ নং (ক) ধারায় বলা হয়েছে 'যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিকদের যেকোন শ্রেনীর ধর্মীয় অনুভূতিতে কঠোর আঘাত হানার অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষাত্মকভাবে কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর সাহায্যে সে শ্রেনীর ধর্মকে বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অপমান করে বা অবমাননা করার উদ্যোগ গ্রহন করে সে ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদন্ডে, যেটার

www.nagorikpathagar.org

মেয়াদ দু'বছর পর্যন্ত হতে পারে বা অর্থদন্ডের বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবে। এটার ২৯৮ ধারায় রয়েছে 'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃত ভাবে কোন ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির শ্রুতি গোচরে কোন অংগভংগি করে বা কোন বস্তু রাখে সে এক বৎসর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হতে পারে এমন মেয়াদের উভয় ধরনের কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে।

এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমানিত হল ধর্মের অবমাননা দন্ডযোগ্য অপরাধ। পৃথিবীর অনেক দেশেই ল অব ব্লাশফেমী (আল্লাহ নিন্দা আইন) চালু রয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানা মারাত্মক অপরাধ। এর ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। সমাজে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। বিদেশী চক্রান্তকারীরা দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির সুযোগ পায়। ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত গাছের শিকড় কেটে ফেলার নামান্তর।

এখন মূল্যায়ন করা প্রয়োজন মুসলিম নামধারী ধর্ম কটাক্ষকারীদের জন্য বর্তমান প্রচলিত শাস্তির আইন যথেষ্ট কিনা? ইসলামী আইনে তাদের জন্য কি শাস্তি নির্ধারিত? বাংলাদেশ ফৌজদারী দন্ডবিধিতে ধর্ম অবমাননার শাস্তির জন্য যে আইন রয়েছে তা মুসলিম নামধারনকারী ধর্ম বিদ্বেষী মুরতাদদের জন্য যথেষ্ট নয়। বিশ্বের অনেক দেশেই ধর্ম অবমাননার জন্য পৃথক শাস্তির বিধান রয়েছে। তাই বাংলাদেশেও এজন্য দন্ডবিধিতে একটি স্বতন্ত্র ধারা সন্নিবেশিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যেসব ব্যক্তিরা আপত্তি তোলেন তা অযৌক্তিক। কেননা খ্রীস্টান ইহুদী ধর্মের অনুসারীরা যদি গনতন্ত্রের বড় ধজাধারী হয়েও নিজেদের দেশের শাসনতন্ত্রে তাদের ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্ম প্রবর্তকের বিরুদ্ধে কথা বলার তথা কথিত গনতান্ত্রিক অধিকার না দিতে আপোষহীন থাকেন। শাস্তি বিধান করে তাহলে আমাদের দেশে আপত্তি কিসের? অপর দিকে কোন অমুসলিম ব্যক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে বললে বা লিখলে মুসলমানদের কে যত বেশী বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়। তার চেয়ে অনেক বেশী বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয় মুসলমানদের মাধ্যমে অবমাননাকর লিখা দিয়ে এ কারণে ইসলাম বিরোধি শক্তি এদের প্রচুর অর্থ দিয়ে। প্রলুব্ধ করে, অতএব তাদের কঠোর শাস্তি হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।

ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদগার, কটুক্তি, কটাক্ষ বন্ধ করা জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও প্রয়োজন। পার্শ্ববর্তী একটি দেশ ধর্মদ্রোহীদের মদদ দিয়ে যাচ্ছে। ভারতের স্টেটম্যান পত্রিকায় এক নিবন্ধে তসলিমার ধর্মদ্রোহীতা প্রসংগে লিখেছে "Taslima Nasrin has done no wrong" ভারতের ক্ষমতাসীন দলের মন্তব্য 'বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ ও প্যান ইসলামীজমের মধ্যে যুদ্ধ চলছে বাংলাদেশের প্রগতিশীল পতাকা সুমুন্নত রাখতে ভারতের নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। অতএব ইসলাম বিরোধি মহলের ষড়যন্ত্র নস্যাতে ইসলামী শক্তির ঐক্যের পাশাপাশি অবিলম্বে ধর্মঅবমাননার জন্য কঠোর শাস্তি সম্বলিত আইন প্রবর্তন প্রয়োজন। ইসলামী আইন চালু সাপেক্ষে প্রচলিত আইনেও শাস্তি বিধান করে ধর্ম অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া যায়।

www.nagorikpathagar.org

অর্থবহ নাম রাখুন সুন্দর নামে ডাকুন

মানুষ একে অপরের নাম ধরে ডাকে। কেউ কারো সাথে পরিচয়ে শুরুতে জানতে চায় 'আপনার নাম কি।' এভাবে পরিচয়ের জন্য, সনাক্তকরণের তাগিদে নামের উদ্ভব। শুধু সনাক্তকরণই নামকরনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তাহলে নামের বদলে নাম্বার ব্যবহার করে সে প্রয়োজন পূরণ হত। মানুষের নামে থাকে তার জাতির পরিচয় যেমনি কারো পদবী দেখেই তার বৃত্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। যেমন আবদুল্লাহ বা আব্দুর রহীম নাম শুনেই ভোটার তালিকা বা পরিচয় পত্র দেখা ছাড়া বুঝা যায় তিনি মুসলিম। সেই সাথে ইমাম, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর প্রভৃতি পদবীর কথা শুনেও একজন ব্যক্তির বৃত্তি সম্বন্ধে উপলব্ধি করা যায়। যদিও কোথাও এর ব্যত্যয় ঘটতে দেখা যায় তবে সে নজীর নগন্য।

এ নামকরণের মাধ্যমে চিন্তাধারা ও মনমানসিকতার বহিঃপ্রকাশও ঘটে। যেমন কেউ ইসলামকে মনে প্রাণে ভাল জানলে তাঁর সন্তানের নাম রাখার চেষ্টা করেন ইসলামের ইতিহাসে যারা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁদের নামের আলোকে; কুরআন হাদীস থেকে নাম বাছাইয়ের চেষ্টা করেন। অনেকেই বিয়ের আগেই মনে মনে ভাবেন আমার প্রথম সন্তানের নাম হাসানুল বান্না কিংবা মরিয়ম জামিলা রাখব। আবার যারা ক্রীড়ামোদী তারা পছন্দ করেন পছন্দসই কোন ক্রীড়া তারকার নাম। যারা হিন্দী ছবি দেখতে অভ্যস্ত তাঁরা কোন অভিনেতা, অভিনেত্রীর নামকেই পছন্দ করতে দেখা যায়। সাধারণতঃ নিজের নাম রাখা কেন্দ্রীক নিজের কোন দায়দায়িত্ব নেই তবুও বড় হলে নামকরণ কেন্দ্রীক ব্যঙ্গ, কটুক্তি, গঞ্জনা তাকেই সইতে হয়। কোন সময় বিয়ের আসরে, পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশান, বা চাকুরীর ইন্টারভিউতে বড় ধরনের বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। আমার এক আত্মীয়ের বিয়ের দিন নব বধুর নাম সংশোধন করে রাখতে হয়েছে। কারণ পূর্বের নাম ছিলো নিরর্থক। অনেকেই মনে করেন 'নামে কি আসে যায়' তারা সেক্সপীয়াঁর থেকে উদ্ধৃত করেন–

What's is name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet

নামে কি আছে? গোলাপকে যে নামেই ডাকি না কেন তা সুগন্ধ বিতরণ করবেই। বাঙালী কবি সুনির্মলবসু অনুরূপ উক্তি তার 'কানাকড়ি' কবিতায় করেছেনঃ

ছেড়ি তোর নেড়ি নামে কিবা পরিতাপ
গোলাপে যে নামে ডাকে তবুও সে গোলাপ।

ইদানীং আমাদের দেশে এমন এমন নাম রাখা হচ্ছে যার অর্থ আরবী, বাংলা, ইংরেজী কোন অভিধানেই খুঁজে পাওয়া যায় না। এক সময় আমাদের দেশের মুসলিম পরিবার আলেম ওলামাদের পরামর্শ নিয়ে আরবী নাম রাখার রেওয়াজ ছিলো। এরপর ইংরেজী নাম রাখার রেওয়াজ শুরু হয়। বর্তমানে কিছু কথিত

www.nagorikpathagar.org

অভিজাত পরিবারে সংস্কৃত নাম রাখার প্রতিযোগিতা চলছে। আরবী নামও যারা রাখেন অনেকেই অর্থ না বুঝে শ্রুতিমধুর মনে করেই রাখা শুরু করেন যা সম্পূর্ণ অনুচিত। যেমন কামরুন্নাহার অর্থ দিনের চাঁদ, খায়রুল বাশার সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, কালো মেয়ের নাম Beauty বা হাসিনা। আবার অনেকেই Tom, John, Milton, Shelly প্রভৃতি নাম রাখতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন। ইশিতা, নিদমা কিন্তু এ ধরনের নাম যখন কাউকে বলতে শুনি তখন মনে হয় তাদের প্রগতির ছোঁয়ায় নাম রাখার ক্ষেত্রে অর্থ তালাশের মানসিকতাই লোপ পেয়েছে।

গত কিছুদিন পূর্বে ঢাকার একটি প্রতিষ্ঠানে নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিতি অনুষ্ঠান চলছিলো। সকলে আপন পরিচয় দিতে গিয়ে যেসব নাম বললো তা হচ্ছে, 'আকাশ, সনি, ছোটন, জামিল, রায়হান, স্নিগ্ধা, এ্যারোমা, এ্যামিলি, মৌসুমী, সুমী, আশা, খোকা, ফারুক, পল্লব, যোথী, ইতি, অনিকেতা, শান্তি প্রভৃতি। শিক্ষক মহোদয়ের ডাক নাম 'বাবু'। তিনি এক পর্যায়ে নামের বিড়ম্বনার উপর আক্ষেপ করে ক্ষেদোক্তি করলেন, 'আমি যখন আমার আম্মাকে বললাম আমার এ নাম রাখা হলো কেন?' তিনি জবাব দিলেন 'আমাদের ভালো লেগেছে তাই।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন আম্মু, আমার নামের অর্থ কি?' আম্মা তখন নিরুত্তর। একটু পর জবাব দিলেন, 'আমরা অর্থ তালাশ করে তোমার নাম রাখিনি।' তিনি পাল্টা বললেন, 'আম্মু তোমরা কি কখনও ভাবনি তোমার শিশু একদিন বড় হবে, সমাজে বিভিন্ন স্থানে ঘুরবে, এ নামে অনেকেই ডাকবে অফিসিয়াল কার্যক্রমে এ নামই ব্যবহৃত হবে।' সত্যি, ক'জন অভিভাবক সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে অর্থের কথা ভাবেন? যেমন 'পল্লব' যার অর্থ পাতা। 'ইতি' যার অর্থ শেষ। এ ধরনের নামকরণের হেতু কি? সেই শিক্ষক মহোদয়ের প্রশ্ন হলো 'যদি পল্লব কারো নাম হতে পারে, তাহলে ডাল, শাখা কেনো নাম হতে পারবে না? আর একেবারেই চিন্তা ছাড়া যদি নাম রাখা হয় তাহলে কাউকে মীর জাফর, আবু জেহেল, ফেরাউন নামে ডাকতে-ত শোনা যায় না। তাহলে বুঝা যায় নাম রাখার ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু না কিছু চিন্তা প্রয়োজন। তাই ভালোভাবে চিন্তা করে অর্থবহ নাম রাখা অভিভাবকদের দায়িত্ব।

নামকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। কার্লাইল ঠিকই বলেছেন, Giving a name, indeed is a poetic art all poetry if we go to that with it is but a giving of names." নামকরণ প্রকৃতপক্ষে এক কাব্য নয়, আর্ট। সব কবিতায় অনুধাবন করলে দেখতে পাই তার আর্টই হচ্ছে নামকরণ। সুন্দর নাম রাখা সুন্দর নামে ডাকা মুসলিম সমাজের চিরায়ত সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। মহান রাব্বুল আলামীন সূরা আল আরাফের ১৮০নং আয়াতে বলেছেন, 'আল্লাহর সুন্দরতম নাম আছে সে নামে তাকে ডাকো।' হযরত আবু দারদা বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিনে তোমাদেরকে ডাকা হবে তোমাদের নাম এবং তোমাদের পিতাদের নামে। তাই তোমাদের নামগুলো সুন্দর রাখো।' রাসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে কোন নতুন ব্যক্তি এলেই তার নাম জিজ্ঞাসা

www.nagorikpathagar.org

করতেন। অপছন্দ হলে তার সে নাম পরিবর্তন করতেন।

প্রত্যেক মুসলিমের সুন্দর ও অর্থপূর্ণ নাম হওয়া আবশ্যক। রাসূলে করীম (সাঃ) পিতার উপর সন্তানের হক কি এ প্রশ্নের জবাবে ইরশাদ করেন, 'যার সন্তান জন্ম গ্রহণ করে সে যেনো তার সুন্দর নাম ও সুশিক্ষা দেয় এবং সাবালক হলে তার বিবাহ দেবে। প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিবাহ না দেবার কারণে গুনাহ হলে সে গুনাহ তার পিতার উপর বর্তাবে।' ইদানীং নিজেকে প্রগতিশীল প্রতিপন্ন করার মানসে বিদেশী, ফিল্মী নাম রাখার ঢং চলছে।

বিভিন্ন ধর্মে শিশুদের নামকরণের সময় নির্দিষ্ট। হিন্দুধর্মে দশ বা বারো দিনের কোনো শুভ মুহূর্তে মনুর অনুশাসন অনুযায়ী নামকরণ করা হয়। ব্রাহ্মণ সমাজের অনুসৃত নীতি ইহাই। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্ররা যথাক্রমে ১৬, ২০, ২২ বা ৩২ দিনে নাম গ্রহণ করবে। পারসিকগণ সন্তানের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হবার পূর্বে নাম রাখে না। গ্রীসে সাত অথবা দশ দিনে পিতা কর্তৃক নামকরণ করা হয়। রোমে পুত্রের নবম দিনে কন্যার দশম দিনে নামকরণ করা হয়। রাসূলে করীম (সাঃ) নবজাতক শিশুর মুখে মিষ্টি জাতীয় নরম খাদ্য দিয়ে তাহনীক করতেন। তিনি প্রথমে খেজুর নিয়ে তা চিবিয়ে নরম ও তরল করে শিশুর মুখে দিতেন। আমাদের দেশে মধু দ্বারা তাহনীক করার প্রচলন ছিলো। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনুযায়ী ও সদ্যপ্রসূত শিশুকে মিষ্টি জাতীয় খাবার দিলে তার পাকযন্ত্রের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ভালো হয়। রাসূল (সাঃ) সুন্দর নাম পছন্দ করতেন। তাই তিনি আদেশ করেছেন, 'তোমাদের নামগুলো সুন্দর রাখো।' কেনো ব্যক্তির নাম অপছন্দ হলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার নাম পরিবর্তন করে দিতেন। ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (সাঃ) আছিয়া (বিদ্রোহিনী, একগুয়ে) নাম পরিবর্তন করে বললেন তুমি কামিলা। সায়ীদ আল মাখযুমীর নাম ছিলো আসসারারস (কঠোর) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার নাম রাখলেন সায়ীদ (সুখী, সৌভাগ্যবান)। সাইয়েদ ইবনে মুসাইয়্যাব বলেন, তিনি তার দাদা থেকে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসাইয়্যেবের দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর দিলো হাযন (শক্তমাটি)। তিনি বললেন, তুমি সাহল (নরম মাটি)।

মানুষের জীবনে নামের সুগভীর প্রভাব পড়ে। একজন ইংরেজ উপন্যাসিকের মন্তব্য– `There is a strange rind of manle leias which good or bad names irresistingly impressed upon our character and conduct." ভালো বা মন্দ নামের বিচিত্র যাদুকরী প্রভাব অনিবার্যভাবে আমাদের চরিত্র ও আচরণকে প্রভাবিত করে। ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। তাই কাউকে অসুন্দর বা মন্দ নামে ডাকতে তিনি নিষেধ করেছেন। ব্যঙ্গ করে মন্দ নামে একে অপরকে ডাকার কারণে অনেক সময় বন্ধু মহলে বিরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হতেও দেখা যায়। ছেলে-মেয়েদের সুন্দর নাম রাখা পিতা-মাতার দায়িত্ব, আর সুন্দর নামে ডাকা সকলেরই কর্তব্য।

www.nagorikpathagar.org

শাফায়াত

শাফায়াত শব্দটি আরবী ভাষায় সাহায্য প্রার্থনা, শাস্তি থেকে পরিত্রানের জন্য মাধ্যম গ্রহণ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা রাগেব ইসফাহানী তাঁর মুফরাদাত গ্রন্থে উল্লেখ করেন কোন মানুষ কল্যাণকর কাজে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা কামনার নাম শাফায়াত। কামুস নামক অভিধানে শাফায়াত অর্থ- Medition Advocacy. Interession of the prophets বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ডঃ ইবরাহীম তাঁর মুজাম অভিধানে লিখেন 'শাফায়াত' শব্দটি 'শাফয়ুন' থেকে উৎপত্তি যা জোড় অর্থে ব্যবহৃত। কেননা যে ব্যক্তি অপরের নিকট শাফায়াত কামনা করেন তিনি একা থাকেন না, সে ক্ষেত্রে তাঁর সাথে সুপারিশকারী যুক্ত হয়ে দু'জন হয়ে পড়েন। আকীদাতুল মুমীন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়, শাফায়াত হচ্ছে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তার সমস্যা সমাধানের জন্য ক্ষমতাধর শক্তির নিকট কোন বিশেষ মাধ্যমে সহযোগিতা কামনা করা।' এখন মূল্যায়ন করা প্রয়োজন আমাদের সমাজে প্রচলিত শাফায়াত সম্পর্কিত বর্তমান ধারণা কতটুকু সঠিক? যারা আখিরাতে নাজাতের জন্য কবরবাসীদের শাফায়াত কামনা করেন তা ইসলাম অনুমোদিত কিনা?

অপরদিকে আখিরাতে শাফায়াত লাভ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য কি? বর্তমান সমাজে অনেক বুজুর্গ ব্যক্তিদের নিকট রোগমুক্তি, অভাব বিমোচন, সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্য কামনা করেন। এসব কারণে শত শত মাইল দূর থেকেও বিভিন্ন খানকাহ্ বা মাজারে যেতে দেখা যায়। এখন কুরআন হাদীসের আলোকে চিন্তা করা প্রয়োজন এটা কতটুকু সঠিক? এ কথা সর্বসম্মত যে কোন মৃত ব্যক্তি তিনি যতবড় বুজুর্গ হোন না কেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কবরের পাশে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য কামনা সুস্পষ্টভাবে কুরআন হাদীসে নিষেধ রয়েছে। কেননা মৃত ব্যক্তির পক্ষে সমস্যা শ্রবন ও সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অসম্ভব। তাই মৃত ব্যক্তির মাযারে পুত্রহীনদের সন্তান কামনা, চাকরীহীনদের চাকরি প্রার্থনা না জায়েয। কিন্তু হাঁ, কোন জীবিত ব্যক্তির নিকট শরীয়াত অনুমোদিত পন্থায় বৈধ কাজে সাহায্য কামনা করা যেতে পারে। রাসূল (সাঃ) একবার হযরত ওমর (রাঃ)কে ওমরা করার জন্য কাবার দিকে যাওয়ার সময় বলেছিলেন, হে ওমর! দোয়ার মুহূর্তে আমাদের কথা ভুল না এ থেকে বুঝা যায় কোন মুসলিম অন্যের নিকট দোয়া কামনা করা জায়েয।

পাপ কাজে বা অপরের অধিকার হরণে সাহায্য কামনা করে দোয়া প্রার্থনা ইসলাম অনুমোদন করে না। মানব জীবনে অশান্তি সৃষ্টি, সমাজ জীবনে অন্যের অধিকার খর্ব করার কাজে কোন মহৎ ব্যক্তির কাছে দোয়া কামনা অবৈধ। এখন চিন্তার বিষয় রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে যেসব সুপারিশ করা হয় তা বৈধ কিনা? প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নিজস্ব অধিকার যথাযথভাবে যেন ভোগ করতে পারে ইসলাম সেদিকে গুরুত্ব দিয়েছে। এ জন্য নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়; বিভিন্ন কাজে সুপারিশ গ্রহণ বা দান করাকে বৈধ করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

(১) ব্যক্তিগত অধিকার থেকে কোন ব্যক্তি বঞ্চিত থাকলে তা প্রাপ্তির জন্য সুপারিশ করা।

(২) কোন 'মুবাহ' বিষয়ে যাতে সামাজিক বা ব্যক্তিগত উপকারের আশা করা যায় যেমন ব্রীজ নির্মাণ, প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে অন্যের সুপারিশ বৈধ।

(৩) এমন বিষয় যেক্ষেত্রে অন্যের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বৈধ জিনিস হারাবার আশংকা দেখা দিয়েছে সেক্ষেত্রে সুপারিশ গ্রহন বা করা বৈধ। অবশ্য কোন অবৈধ কাজ অপরের অধিকার খর্ব অথবা শরীয়াত নির্ধারিত কোন দণ্ড মওকুফের জন্য সুপারিশ গ্রহণ বা করা অবৈধ। হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যখন শাসক কোন বিষয়ে দণ্ড দানের সিদ্ধান্তে পৌঁছে তখন সুপারিশ গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। রাসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশায় একবার চুরির ঘটনা সংঘটিত হলে হাত কর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়। তখন কেহ কেহ রাসূল (সাঃ) এর নিকট সুপারিশ করলে তিনি জবাবে বলেছিলেন "মুহাম্মদ (সাঃ) তনয়া ফাতেমাও যদি চুরি করত অবশ্যই তার হাত কেটে দেয়া হত।" এ হাদীস থেকে বুঝা যায় বর্তমান সমাজে বিভিন্ন অপরাধে যাদেরকে দণ্ডিত করা হয় তাদের পক্ষে ওকালতি বা সুপারিশ ইসলাম সমর্থন করে না। এতে সমাজে দিন দিন অপরাধ প্রবণতা ও অপরের অধিকার খর্বের হীনমানসিকতা বৃদ্ধি পায়। যা সুন্দর সমাজে জীবন নিশ্চিত করার পথে অন্তরায়। উল্লেখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হল শাফায়াতের দুইটি দিক বিদ্যমান (১) দুনিয়ার জীবনে (২) পরকালীন ক্ষেত্রে।

দুনিয়ার জীবনে মৃত ব্যক্তিদের নিকট সুপারিশের প্রার্থনা ভ্রান্ত আকীদা ছাড়া কিছুই নয়। এখন আলোচনা করা দরকার আখিরাতে শাফায়াতের প্রকৃতি সম্পর্কে। কেননা আখিরাতে শাফায়াতের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের সমাজে অনেক ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। অনেক মূর্তি পূজক বিশ্বাস পোষণ করে তাদের এসব প্রতিমা পরকালে সুপারিশ করবে। সূরা ইউনুসের ১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে "এই লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব জিনিসের পূজা-দাসত্ব করে যাহা না তাহাদের ক্ষতি করতে পারে, না কোন উপকার।" তাহারা বলে যে ইহারা খোদার নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী। হে মুহাম্মদ তাহাদের বল "তোমরা কি খোদাকে এমন সব খবর দিতেছ যাহা তিনি না আসমানে জানেন না যমীনে? মহান পবিত্র তিনি এই শেরক হইতে বহু উর্ধ্বে যা এই লোকেরা করে।" এ আয়াত থেকে জানা যায় মূর্তি পূজারীরা পরকালে প্রতিমাগুলো তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে এ ধারণায় মূর্তি পূজা করে। অথচ এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে মনে করেন নেক ব্যক্তিদের মুরীদ হলেই যথেষ্ট। পরকালে তারা শাস্তি থেকে পরিত্রানের ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট সুপারিশ পেশ করবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা নিসার ১২৩ ও ১২৪ নং আয়াতে এ ধারণা অমূলক বলে ইরশাদ করেন 'যে পাপ করবে সেই তাহার প্রতিফল পাবে এবং খোদার বিরুদ্ধে নিজের জন্য কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাইবে না আর যে নেক কাজ করবে সে পুরুষ হউক আর স্ত্রী হউক সে যদি ঈমানদার হয় তবে এই ধরনের লোকই বেহেস্তে প্রবেশ

www.nagorikpathagar.org

করবে এবং তাদের বিন্দুমাত্র হকও নষ্ট হতে পারবে না" এ আয়াত থেকে বুঝা যায় আখিরাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃতকর্ম অনুসারেই প্রতিফল প্রাপ্ত হবে। এ থেকে আরেকটি প্রশ্ন জাগে কুরআন ও হাদীসে শাফায়াতের স্বীকৃতি আছে কিনা? আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণ আখিরাতে শাফায়াতের ধারণাকে সঠিক বলে মনে করেন। তারা বলেন, 'আখেরাতে শাফায়াত সাধারণভাবে সকলের জন্য সকল সময় স্বীকৃত নয় বরং বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর অনুমোদন প্রাপ্ত পুন্যবানরাই কেবল শাফায়াত করতে পারবেন, আহলে সুন্নাত ওয়ালজামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হয়, আখিরাতে শাফায়াতের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্ত বিদ্যমানঃ-

(১) আল্লাহর অনুমোদন প্রাপ্তদের জন্যই শাফায়াতের সুযোগ থাকবে। এ প্রসংগে সূরা বাকারার ২৫৫ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে 'আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্ব চরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া আছেন, তিনি ছাড়া আর কেহ খোদা নেই, তিনি না নিদ্রা যান না তন্দ্রা তাহাকে স্পর্শ করে। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু সব তাঁরই। কে এমন আছে যে তার দরবারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারে?' এ আয়াত থেকে বুঝা যায় আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো পক্ষে শাফায়াত করা সম্ভব হবে না। সূরা হুদের ১০৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'উহা (কিয়ামত) যখন আসবে তখন কারো পক্ষে কথা বলা সম্ভব হবে না, তবে খোদার নিকট হতে অনুমতি নিয়ে কিছু বললে অন্য কথা' এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি নিয়ে সুপারিশ করা যাবে। সূরা নাবার ৩৮ নং আয়াতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'যে দিন রূহ ও ফেরেশতা কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়াবে, কেউ টু শব্দ করতে পারবে না। সে ব্যতীত যাকে পরম দয়াবান অনুমতি দান করবেন এবং সে যথাযথ কথা বলবে।'

(২) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ অনুমতি দান করবেন শুধু তার জন্যেই শাফায়াত করা যাবে। যারা সুপারিশ করার সুযোগপ্রাপ্ত হবেন, তারা সাধারনভাবে ইচ্ছামত শাফায়াত করতে পারবেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন- "লা ইয়াশফায়ু ইল্লা লিমানির তাদা" অর্থাৎ সুপারিশ করা যাবেনা তারা ছাড়া যাদের জন্য স্পষ্ট হয়ে অনুমতি দিয়েছেন।

তাই ইসলামী চিন্তাবিদগণ উল্লেখ করেন আখিরাতে শাফায়াত দু'ধরনের হবে।

(১) ইসলামী আকীদা মতে যে শাফায়াতের ধারণা অবৈধ।

(২) ইসলামী চিন্তা ও আকীদা শাফায়াতের যে ধারণাকে স্বীকৃতি দান করে

আখিরাতে অননুমোদিত শাফায়াতঃ-

ইসলাম শাফায়াতের যে ধারণাকে স্বীকৃতি দান করেনা তা কয়েকভাবে হতে পারে-

১. আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য দেবতাকে, অথবা আল্লাহর সমপর্যায় মনে করে বিভিন্ন বস্তু বা সত্তার শাফায়াত কামনা করা, এ প্রসঙ্গে সূরা জুমারের ৪৩ ও ৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে- 'এ খোদাকে বাদ দিয়ে তারা কি অন্যদেরকে শাফায়াতকারী বানিয়েছে? তাহাদিগকে বল উহারা কি শাফায়াত করিবে। উহাদের কোন ক্ষমতা না

www.nagorikpathagar.org

থাকলেও এবং কিছু না বুঝলেও। বল সমস্ত শাফায়াত কেবলমাত্র আল্লাহরই ইখতিয়ারভুক্ত। আকাশ মন্ডল এবং পৃথিবী বাদশাহীর তিনিই তো মালিক। পরে তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফহীমূল কুরআনে উল্লেখ করা হয়, এসব লোকেরা নিজেরাই নিজেদের মত এ ধারণা করে নিয়েছে যে কিছু সত্ত্বা আছে যারা আল্লাহতায়ালার সমীপে বড়ই প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান। যাদের সুপারিশ কোনক্রমেই রদ হতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত কথা তাদের সুপারিশকারী হওয়া সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই এবং আল্লাহতায়ালা কখনও এ এরশাদও করেননি যে, 'আমার কাছে তাদের এরূপ মর্যাদা আছে এবং সেই সত্ত্বারাও কখনও এ দাবী করেননি যে, আমরা নিজেদের প্রভাব ও ক্ষমতায় তোমাদের সকল কাজ সম্পন্ন করে দেব।' বস্তুত আল্লাহ ছাড়া অন্যদের সর্বেসর্বা মনে করা মারাত্মক ভুল।

(২) আল্লাহর অনুমতি ছাড়া বা অনুমোদনকৃত ব্যক্তিদের ছাড়া অন্যদের জন্য সুপারিশ করা। আল্লাহ যার পক্ষে সুপারিশ শুনতে নারাজ তার জন্য সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না। সূরা আম্বিয়ার ২৮নং আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা কারো পক্ষে সুপারিশ করে না শুধু তাদের জন্য করে যার পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ রাজী হবেন। আর তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।'

উল্লেখিত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, আখিরাতে সকল ধরনের সুপারিশ গ্রহনযোগ্য হবে না।

আখিরাতে অনুমোদিত শাফায়াত

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, আখিরাতে শাফায়াতের অনুমতি থাকবে। এ শাফায়াত দু'ধরনের হবে (১) নবী (সঃ) এর শাফায়াত (২) বিভিন্ন নেক বান্দাদের শাফায়াত। শাফায়াতের ধরন সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে 'শরহে আকীদাতুত তাহবীয়া' নামক গ্রন্থে রাসুল (সাঃ) এর শাফায়াতের প্রকৃতি ৮ ধরনের উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্য হতে কিছু উল্লেখ করা হল।

১. শাফায়াতুল উজমাঃ মহা শাফায়াত ঃ এটা শুধু রাসূল (সাঃ) এর জন্য নির্দিষ্ট। হাদীসে শরীফে উল্লেখ রয়েছে হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষ বিচারের কার্যক্রম শুরুর অপেক্ষায় থাকবে। সূর্যের প্রখর তাপে কারো বুক কারো কান পর্যন্ত ঘাম হবে। এমতাবস্থায় হাশরবাসী হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ) প্রমুখ নবী ও রাসূলদের নিকট আবেদন করবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার জন্য যেন দ্রুত বিচারের কাজ শুরু হয়। সকলেই অক্ষমতা প্রকাশ করবে। অবশেষে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট হাশরবাসী আসবে। রাসূল (সাঃ) তখন সিজদাবনত হয়ে বিচার শুরুর আবেদন জানাবেন। অতঃপর আল্লাহ বিচার ফায়সালা শুরু করবেন। রাসূল (সঃ) কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মাকামে মাহমুদে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। সূরা বনী ইসরাইলের ৭৯ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে 'আর রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদ পড়। তা তোমার জন্য নফল। অসম্ভব নয় যে তোমাকে তোমার মাবুদ মাকামে মাহমুদে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন।' রাসূল (সাঃ) দুনিয়া ও আখিরাতের এরূপ মর্যাদায় উন্নীত হবেন যে তিনি সমগ্র সৃষ্টি দ্বারা প্রশংসিত হবেন।

www.nagorikpathagar.org

২. বেহেশতের দরজা রাসূল (সাঃ)-এর সুপারিশে বেহেশতবাসীদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। উম্মতে মুহম্মদীই প্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে।

৩. রাসূল (সঃ) এর সুপারিশে যে সমস্ত পাপী উম্মতের জন্য দোজখে যাওয়া অবধারিত হয়েছে, তাদের জন্য সুপারিশ করবেন দোজখের শাস্তি থেকে মুক্তি দানের জন্য।

৪. যে সমস্ত উম্মতের পাপ পুণ্য সমান সমান হবে তাদের জন্য সুপারিশ করবেন যেন বেহেশত দান করা হয়।

৫. জান্নাতবাসী উম্মতের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফায়াত করবেন।

৬. রাসূল (সাঃ) কিছুসংখ্যক উম্মতকে বিনা হিসেবে বেহেশত দানের জন্য শাফায়াত করবেন।

৭. তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের জন্য শাফায়াত করবেন যারা দোজখে জ্বলছে সাময়িক শাস্তি ভোগের জন্য। রাসূল (সাঃ)-এর শাফায়াতে তারা দোজখের শাস্তি থেকে মুক্ত হয়ে বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ পাবে।

নবী ছাড়া অন্যদের শাফায়াত

ইবনেমাযাহ শরীফে একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে কিয়ামতে তিন ধরনের ব্যক্তিদের জন্য শাফায়াত করার অধিকার থাকবে, নবীগণ, আলেমগণ, শহীদগণ অন্য একটি হাদীস রয়েছে 'শহীদগণ তার বংশের ৭০ জনের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে পারবেন।" অপরদিকে কুরআনে শাফায়াতকারীদের জন্য বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন– "ফামা তানফায়ুহুম শাফয়াতুশ শাফায়ীন।" এ থেকে বুঝা যায় সুপারিশকারীগণ নবী রাসূল ছাড়া নেক বান্দাদের মধ্য থেকেও হতে পারে। মোদ্দাকথা, শাফায়াত আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিরাই নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য করতে পারবেন। রাসূল (সাঃ) এর শাফায়াত যেন আমরা পাই সে জন্য সদা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে হবে। "আল্লাহুম্মারজুকনি শাফায়াতা নাবিয়্যিকা" –"হে আল্লাহ আমাকে নবীর শাফায়াত নসীব কর।" আর শাফায়াত পাওয়ার জন্য সদা উত্তম আমল করে যেতে হবে। হৃদয়ে আল্লাহর ইবাদতের একনিষ্ঠতা থাকতে হবে। রাসূল (সঃ) কে জনৈক সাহাবী প্রশ্ন করেছিলেন আপনার উম্মতের মধ্যে কারা আপনার শাফায়াতের সৌভাগ্য লাভ করবে? তিনি জবাবে বললেন যারা খালেসভাবে লাইলাহা ইল্লাল্লাহুর স্বীকৃতি দান করবে তারা শাফায়াতপ্রাপ্ত হবে। এ শাফায়াত প্রাপ্তির জন্য বাস্তব জীবনে ইসলামের অনুসরণ প্রয়োজন।

সহীহ হাদীসে রয়েছে রাসূল (সাঃ) বলেন "অধিক সিজদার মাধ্যমে আমার শাফায়াত কামনা কর।" সদা সর্বদা হযরত (সাঃ) এর শাফায়াত প্রাপ্তির জন্য কায়মনে আরাধনা করতে হবে। তিনি ইরশাদ করেছেন "যে ব্যক্তি আমার শাফায়াত কামনা করে তার জন্য আমার শাফায়াত বৈধ হয়ে যায়" উল্লেখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, বর্তমানে শাফায়াত সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত ধারণা কতটুকু সঠিক। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে শাফায়াত কতিপয় শর্তাধীনে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত।

www.nagorikpathagar.org

কুরবানীর তাৎপর্য ও শিক্ষা

কুরবান আরবী শব্দ। বাংলা অর্থ নৈকট্য লাভ। এমন প্রত্যেক কাজ বা বস্তুকে কুরবান বলা হয় যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে তাঁর নৈকট্য লাভ করা যায়। জীব, জন্তু জবেহ্ করে কিংবা অন্যান্য দান খয়রাত বা নেক আমলের মাধ্যমে যে কোন পন্থায় হউক না কেন। কিন্তু পরিভাষায় কুরবানী বলতে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত জন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জবেহ্ করাকে বুঝায়। এখন চিন্তা করা প্রয়োজন পশু কুরবানীর বর্তমান পদ্ধতি কিভাবে শুরু হলো? এ কুরবানীর উদ্দেশ্য কি? এটাকি নিছক পশু নিধন? না এতে মহৎ কোন উদ্দেশ্য বিদ্যমান।

আমরা দেখছি বিশ্বের শুরু থেকেই কোন না কোনভাবে ত্যাগের বা অন্য উদ্দেশ্যে বিলীন হওয়ার দৃষ্টান্ত। সবুজ, শ্যামলীমা উদ্ভিদ জীব জন্তুর উদর ভর্তির জন্য বিলীন হচ্ছে, মানব সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত বলি হচ্ছে অসংখ্য জীব, স্নেহ্ তুল্য সন্তান লালন-পালনে পিতা-মাতা ত্যাগ করছেন আরাম-আয়েশ, দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সেনাপতির নির্দেশে জীবন বিকিয়ে দিচ্ছে অনেক সিপাহী। এ থেকে বুঝা যায় যে কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী পূর্বশর্ত, ত্যাগ ছাড়া অর্জন করা যায় না উন্নতি, অগ্রগতি, পাওয়া যায় না মনিমুক্তা হীরক খণ্ড, লাভ করা যায় না স্বাধীনতা, হটানো যায় না স্বৈরাচার, কল্পনা করা যায় না জাতীয় মুক্তি। তেমনিভাবে নফসের দাসত্ব; বৈষয়িক অর্থনৈতিক লোভ লালসা, রিপুর তাড়না ত্যাগ ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালবাসা অর্জন করা অসম্ভব। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অহংবোধ আছে তা ত্যাগ করে আল্লাহর কাছে নত হয়ে (সম্পূর্ণ ভাবে) নিজের জীবনের সবকিছু সঁপে দেয়ার মাধ্যমেই সম্ভব আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। একটি প্রাণীর কুরাবানী এ কথারই ইঙ্গিতবহ যে প্রয়োজনে জীবন, মৃত্যু সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয়িত হবে। জড়বাদী চিন্তা, স্বার্থপর কল্পনা, ভোগবাদী মানসিকতায় জীবন ব্যয় করে যারা, তাদের মাধ্যমে সুন্দর সমাজ আশা করা যায় না। একটি সুখী সমাজ, সুন্দর পৃথিবী গড়তে হলে প্রয়োজন একটি কেন্দ্রীয় পবিত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানবীয় সভ্যতা ও সমাজের বিকাশ, 'কুরবানীর' যে দোয়া "ইন্না সালাতি ও নুছুকী ও মাহইয়ায়া ও মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" এর মাধ্যমে মানবীয় সমাজের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য সুনির্ধারিত।

জীবন মৃত্যু যদি হয় একমাত্র আল্লাহর জন্য সেখানে বৈষয়িক স্বার্থে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব সংঘাত, হানাহানি যুদ্ধ বিগ্রহ অকল্পনীয়। যে জীবন ছুটে চলে মৃত্যুর দৃঢ় বিশ্বাস সামনে রেখে, জীবন্ত পশুর হঠাৎ নিথর দেহ যদি কল্পনা জগতে আবেগের সৃষ্টি করে। আমাকেও মরতে হবে একদিন এ অনুভূতি যার হৃদয়ে জাগ্রত থাকে সে জীবনে শঠতা, কপটতা, অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপের চিন্তা, কিংবা প্রাপ্যের চেয়ে অবৈধভাবে অধিক ভোগের কল্পনা আসতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

কুরবানীর পশুক্রয়ে ' সামর্থের আলোকে উত্তম পশুক্রয়ের নির্দেশ দানের মাধ্যমে কৃপণতা দূর ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের যে মানসিকতা সৃষ্টি হয় তা সামাজিক অনেক সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালনে খুবই সহায়ক। অপরদিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের গভীরতার প্রমাণ পাওয়া যায় এ কুরবানীর মাধ্যমেই। এ কারণেই দেখা যায় আদিকাল থেকেই প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানী প্রথা ছিল। হযরত আদম (আঃ) এর দু'পুত্র হাবিল ও কাবীলের মধ্যকার বিবাহ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে দু'জনকেই খোলা আকাশের নীচে কুরবানী দিতে আদেশ দেয়া হয়েছে। তৎকালীন নিয়ম অনুযায়ী আকাশ থেকে আগুন ঝড়ে হাবীলের কুরবানী ভস্মীভূত হওয়ায় প্রমাণিত হয় হাবীলের কুরবানী গৃহীত হয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক ইসমাইল (আঃ) কে কুরবানী করতে নিয়ে যাওয়ার পর তৎপরিবর্তে বেহেশতী দুম্বা যবেহ এর ঘটনার পর থেকেই কুরবানীর বর্তমান সিস্টেম চালু হয়। এখন চিন্তা করা প্রয়োজন এ সিস্টেমের উদ্দেশ্য কি? এটা কি নিছক পশু নিধনের শামিল? না এতে আর্থ সামাজিক কল্যাণ নিহিত আছে।

অতীতের ইতিহাস মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, কুরবানী ইহুদী, খ্রীষ্টান ধর্মসহ বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও চালু ছিল। কিন্তু ইসলামের কুরবানী ও অন্যান্য জাতির কুরবানীর মধ্যে পদ্ধতিগত ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য বিদ্যমান। সূরা কাওসারে উল্লেখ করা হয়েছে 'ফাছাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার'এ আয়াতে কুরবানীর উদ্দেশ্য পশু নিধনের মাধ্যমে গোশ্ত ভক্ষণ নির্ধারিত করা হয়নি বরং আল্লাহর সন্তোষ অর্জনকেই মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা হজ্বে উল্লেখ করা হয়েছে "লা ইয়া নালাল্লাহু লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিন ইয়ানালুহুত তাকওয়া মিনকুম" এ আয়াতে স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহ পশু জবেহের নির্দেশ দিয়ে মানব মনের গভীরে আল্লাহর ভয়ভীতি কতটুকু তা পরীক্ষা করতে চান। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে ধরনের ইখলাস, আবেগ, আন্তরিকতা ও আল্লাহর আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সে ধরনের ঐকান্তিক নিষ্ঠাই কাম্য। মূলতঃ কুরবানীর বর্তমান নিয়ম হযরত ইব্রাহীম (আঃ) থেকেই শুরু। কুরবানীর ইতিহাস বা শিক্ষার সাথে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) এর ঘটনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সে ঘটনা মূল্যায়ন করলে আমরা যেসব শিক্ষা পাই তা হচ্ছে–

১. হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দীর্ঘদিন যাবত সন্তানহীন ছিলেন। জীবনের শেষলগ্নে তিনি পুত্র সন্তান লাভ করেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ) জন্ম লাভ করল। ফুটফুটে চেহারার কচি শিশু সহ হঠাৎ হিজরতের নির্দেশ এল। হিজরত করতে হবে এমন স্থানে যেখানে গাছ পালা, পানি ও জন প্রাণীর কোন চিহ্ন নেই, গরম লুহাওয়া দেহ ঝলসে দেয়। নির্দেশমত অবলা স্ত্রী হাজেরা, কোলের শিশু ইসমাঈলকে নিয়ে অম্লান বদনে প্রসন্ন চিত্তে হিজরত করলেন মক্কায়। কোলের শিশু ইসমাঈল বড় হতে লাগল দিন দিন তার প্রতি ইব্রাহীম (আঃ) এর মায়া, মমতা, স্নেহ সোহাগ ও বাড়ছে। এমতাবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে ইব্রাহীম (আঃ)

www.nagorikpathagar.org

কে পরীক্ষার কঠিন সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হল স্বপ্ন যোগে, সে দিন ছিল ৮ জিলহজ্ব। সারাদিন তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগলেন কি করবেন। তাই আরবীতে ৮ জিলহজ্বকে বলা হয় ইয়াওমুভ তারবিয়া।

ভাবলেন সারাদিন, অবশেষে সন্ধ্যায় একশত উট জবেহ করলেন। পরের রাত্রিতেও একই স্বপ্ন, এবার বুঝতে পারলেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই দেখানো হচ্ছে। এ কারণেই ৯ জিলহাজ্বকে ইয়াওমূল আরাফাহ (পরিচয় দিবস) বলা হয়। সেদিনও একশত উট জবেহ করলেন, ৯ তারিখ রাতে আবারও স্বপ্ন দেখলেন প্রিয় বস্তু কুরবানী করতে। এবার তিনি স্পষ্ট হলেন ইসমাঈল (আঃ) কেই জবেহ করার নির্দেশ। সে তারিখেই তিনি তাঁকে জবেহের সিদ্ধান্ত জানিয়ে জবেহ স্থলে হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে নিয়ে যাওয়ায় উক্ত দিন ইসলামের ইতিহাসে 'ইয়াওমুন নাহর' বা জবেহ দিবস হিসেবে পরিচিত। এখানে যে বিষয়টি শিক্ষাপ্রদ, তা হচ্ছে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অটল, অবিচল থেকে প্রাণাধিক পুত্রকে কুরবানীর জন্য মানসিক প্রস্তুতি। বর্তমানে যাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারন করেছেন তাদেরকে এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে নিজেরা কি যে কোন বিষয়ে আল্লাহর ফায়সালাকে হাসিমুখে মেনে নিতে পারি? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে পরম প্রিয় সন্তানকে স্থির চিত্তে কুরবানীর জন্য নিয়ে যেতে আদৌ কুণ্ঠাবোধ করেননি। অপরদিকে বালক ইসমাঈলের মনেও কোন ভয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল না। বাবার হাত ধরে সামনে অগ্রসর হল আল্লাহর নামে কুরবানী হতে। সূরা সাফফাতের ১০২নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইসমাঈল (আঃ) কে কুরবানীর কথা নিশ্চিত হবার পর তিনি বললেন, হে আমার প্রিয় বৎস, স্বপ্নে আমি তোমাকে জবেহ করতে দেখেছি এখন ভেবে দেখ তোমার কি মত? তিনি (হযরত ইসমাঈল জবাবে) বললেন হে পিতা প্রাপ্ত নির্দেশমত কাজ করুন, "ইনাশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্য্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত পাবেন" বালক হৃদয়ে আল্লাহ প্রেম ও আনুগত্যের অপূর্ব নজীর যুগযুগ ধরে সকলের হৃদয়ে আবেগ সৃষ্টি করবে। সকলের হৃদয়ে অনুপ্রেরণা যোগাবে এভাবে আল্লাহর পথে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয়ার জন্য।

২. হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) এর ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে জানা যায়, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন যবেহ করার জন্য ইসমাঈল কে নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন, সে সময় বাপ ও ছেলেকে তাদের প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত করার অপচেষ্টায় সহানুভূতির ছদ্মাবরণে ইবলীস উভয়ের সামনে পেশ করল আল্লাহর নাফরমানীর ইবলিসী দাওয়াত। কিন্তু আল্লাহর প্রেমে পাগল ইব্রাহীম ও শাহাদাত পিয়াসী ইসমাঈলের প্রত্যয়দীপ্ত পদক্ষেপে ব্যর্থ হয় ইবলীসী চাল। কংকর নিক্ষেপে তাড়িয়ে দেয়া হয় সেখান থেকে। এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে আল্লাহর পথে অগ্রসর হলে শয়তানী চক্রান্ত অবশ্যই আসবে, সে সময়ও দ্বীনের পথে অটল অবিচল থেকে চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৩. হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মুসলিম জাতির নেতা, আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'ইন্নী জায়ীলুকা লিননাসে ইমামা (অর্থাৎ হে ইব্রাহীম, আমি তোমাকে বিশ্বের সমস্ত মানুষের নেতা বানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জীবন থেকে শিক্ষা পাই নেতৃত্বের জন্য মান অনুযায়ী পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী। নেতাকে তাওহীদের পথে আপোষহীন থেকে ঈমানের প্রতিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তাহলেই গায়েবী সাহায্য পাওয়া সম্ভব। আমরা দেখতে পাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মিনা মাঠের তপ্ত বালুতে পরম যত্নে প্রিয় পুত্রকে শুইয়ে শানিত ছুরি হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর গলায় বসাবার সাথে সাথে তার কর্ণে ভেসে আসে হে ইব্রাহীম! থামো, জান্নাত থেকে আল্লাহ দুম্বা পাঠালেন, তাই যবেহ করা হল। এ অনন্য ঘটনা চির অমর করে মানব হৃদয়ে আল্লাহ প্রেমের আবেগ সৃষ্টির জন্যেই কুরবানী ফরয করে দেয়া হল, আগত কালের জন্য। এ থেকে বুঝা যায় পিতার হাতে পুত্রের যবাই আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল না। পিতৃ স্নেহ তথা পার্থিব মায়া মমতা যবাই করাই টার্গেট ছিল, যা কখনো কখনো আল্লাহর সাথে গভীর ভালবাসার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। তেমনিভাবে বর্তমানেও নিছক পশু যবেহ কুরবানীর উদ্দেশ্য নয়। যদি পশু যবেহর মধ্যেই কুরবানীর উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ করা হয় তাহলে কুরবানীর লক্ষ্য পূরণ হবে না। কুরবানীর উদ্দেশ্য পার্থিব মায়া মমতার জাল ছিন্ন করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বস্ব ত্যাগের মানসিক দৃঢ়তা সৃষ্টি। ইমাম গাযযালী এ প্রসঙ্গে লিখেন 'কুরবানী আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভের উত্তম মাধ্যম। সুতরাং স্বতঃস্ফূর্ততা ও পূর্ণ মর্যাদার সাথেই তা পালন করা উচিত এবং এ প্রত্যয় ও প্রত্যাশা থাকা উচিত যে, কুরবানীকৃত পশুর প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে দেহের অনুরূপ অঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।'

কুরবানী অনুষ্ঠান সর্বস্ব উৎসব নয়। এতে রয়েছে হৃদয়ে খোদা প্রেমের গভীর অনুভূতি সৃষ্টি করে বৈষয়িক ভোগ বিলাস ত্যাগের অনুপম শিক্ষা। যার মধ্যে বিদ্যমান সমাজের ভুখা নাঙ্গা মানুষের দুঃখ গ্লানি ঘুচাবার লক্ষ্যে এগিয়ে আসবার জন্য অর্থ ব্যয়ের অনুপ্রেরণা, জাগতিক মোহ ছিন্ন করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অদম্য বাসনা।

কুরবানীর মাধ্যমে পশু সম্পদ অপচয় হচ্ছে যারা এ অভিযোগ পেশ করেন তাদের কাছে কুরবানীর সামাজিক কল্যাণকর দিকগুলো অস্পষ্ট। ইসলামে গোশত বন্টনের যে নিয়ম রয়েছে তা সমাজ জীবনে খুবই কল্যাণকর। রাসূল (সাঃ) কুরবানীর পশুর তিন ভাগের এক অংশ ছদকা করা, তিন ভাগের এক অংশ নিকটাত্মীয় ও তিন ভাগের এক অংশ নিজে ভক্ষনের জন্য বলেছেন। উল্লেখিত বন্টন নীতির মাধ্যমে সমাজের এমন দুস্থ ও গরীব ব্যক্তিদের ঘরে গোশত পৌছে যায় যারা পুরো বছরে ক্রয় করে এক বেলা গোশত খাওয়ার ভাগ্য জুটে না। অথচ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের আলোকে প্রত্যেক মানুষের স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার জন্য গোশত, ডিম, মাছ, শাক-সব্জি খেতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

সারা বাংলাদেশে যত পশু কুরবানী হয় তা লক্ষাধিক হবে। নিঃসন্দেহে তার $^{১}/_{৩}$ অংশের মাধ্যমে কয়েক লক্ষ দুস্থ, কচি শিশু নারী পুরুষের মুখে গোশতের টুকরো দেয়া যাবে যে সকল অসহায় মানুষগুলো ক্রয় করে খেতে পারতো না। সামাজিক জীবনে দুঃস্থদের মাঝে বন্টনের এ ভাবধারা সবসময় কার্যকরী করা গেলে সামাজিক ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব ফেলবে। এ ছাড়া চামড়ার অর্থ যদি পরিকল্পিতভাবে দুঃস্থ পুনর্বাসনের কাজে লাগানো হয় তাহলে যাকাত, ফেতরা প্রভৃতির সাথে সরকারীভাবে সমন্বিত পদক্ষেপ নেয়া হলে দারিদ্রতা বিমোচনে ফলপ্রসূ হয়। এর মাধ্যমে হাজার হাজার দুঃস্থ পরিবারকে প্রতিবছর অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল করা সম্ভব। অপরদিকে লক্ষাধিক পশুর চামড়া বিদেশে রফতানী করার মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় তা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ ছাড়া কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রেমের যে ভাবধারা মানব মনে জাগ্রত হয় তা মানুষকে সৎ, নিঃস্বার্থ, কলুষমুক্ত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে মানুষের মধ্যে সংকীর্ণতা দূরীভূত করে ত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টি করে যা সামাজিক সম্প্রীতিপূর্ণ সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক। অবশ্য বাড়াবাড়ি ঠিক নয়। কোথাও দেখা যায়, একজনকে ১৮টি গরু জবেহ্ করতে, ঢাকা শহরে এক শিল্পপতি অনুরূপ করেছেন বলে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান। এ কথা খেয়াল রাখতে হবে, কোন জনপদে সত্যিই পশু সম্পদের সংকট দেখা দিলে সে সময় যার যতটুকু কর্তব্য ততটুকুই পালন করতে হবে এবং পশু সম্পদ বাড়াবার চেষ্টা করা সকলের দায়িত্ব।

এখন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন কুরআন ও হাদীসের আলোকে অভিযোগের বাস্তবতা কতটুকু। পবিত্র কুরআনে কুরবানীর যেসব নির্দেশ রয়েছে তা তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ–

(১) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ত্যাগের যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা মুসলিম উম্মাহর জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তাঁর খোদাপ্রেমের নমুনা সর্বকালের জন্য আদর্শ। সূরা হাজ্বের ২৬, ২৭ ও ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যখন আমি কাবা সংলগ্ন স্থানকে ইব্রাহীমের আবাসস্থল করলাম ----- এবং মানুষকে হজ্বের জন্য আহবান জানাও। লোকেরা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে পায়ে হেঁটে এবং দুর্বল জন্তুর উপর সওয়ার হয়ে তোমার কাছে আসুক যাতে করে তারা নিজেদের জন্য ফায়দা হাসিল করে এবং নির্দিষ্ট কতিপয় দিনে আল্লাহর দেয়া জন্তুগুলোকে আল্লাহর নামে জবাই করে। অতঃপর তোমরা সেসব জন্তু নিজেরা খাও, বিপন্ন ফকীরকে খাওয়াও। এ আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর অনুপম আদর্শের অনুসরণ ও বিপন্ন ফকীরদের মধ্যে গোশত বন্টনের দিকে ইঙ্গিত করে কুরবানী প্রথা অব্যাহত রাখা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। সূরা হজ্বের ৩৬নং আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে "বস্তুতঃ কুরবানীর উটগুলোকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শনরূপে নির্ধারণ করেছি। ওগুলোতে তোমাদের জন্য

www.nagorikpathagar.org

কল্যাণ নিহিত। অতএব তোমরা ওগুলোকে কাতারবদ্ধ করে ওদের ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। আর যখন ওগুলো শুয়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে তখন তা থেকে নিজেরাও খাও ও ভিখারীকেও খাওয়াও।"

(২) হজ্বে তামাততু ও হজ্বে কিরানের ফিদিয়া হিসেবে। পথিমধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে গেলে অথবা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করার শাস্তি হিসেবে প্রদত্ত কুরবানী। এ সম্পর্কে সূরা বাকারার ১৯৬ আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহর জন্য হজ্ব ও ওমরা সম্পন্ন কর, তবে যদি কোথাও আটকা পড়ে যাও তাহলে কুরবানী করার মত যা কিছু পাঠাতে পার পাঠিয়ে দাও।' সূরা মায়েদার ৯৫নং আয়াতে বলা হয়েছে 'হে মুমিনগণ ইহরাম অবস্থায় কোন জীব শিকার করো না, যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করে ফেলে তবে সে যেন তার বদলায় শিকারকৃত প্রাণীর সমমানের একটা প্রাণী কুরবানী করে।' এ দুটি আয়াতে হজ্বের সময় ফিদিয়া বা কাফফারা হিসেবে কুরবানী করতে বলা হয়েছে। অপরাধ প্রবণতারোধে আর্থিক দন্ডের এ ধরনের বিধান তাৎপর্যবহ।

* (৩) রাসূল (সাঃ) স্বচ্ছল প্রত্যেক মুসলমানকে প্রতিবছর কোরবানী করতে বলেছেন। এ নির্দেশের লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের জীবনের প্রতিটি বিভাগে আল্লাহর প্রেমের গভীর ভাবধারা সৃষ্টি। সূরা আনয়ামের ১৬৩ ও ১৬৪নং আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'হে মুহাম্মদ (সাঃ) তুমি বল যে, আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্ব বিধাতা আল্লাহর জন্য যার কোন অংশীদার নেই। আর আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমি তার নির্দেশ পালনে সর্বপ্রথম।' এ আয়াতে কুরবানীর উদ্দেশ্য আল্লাহর নৈকট্যলাভের মানসিকতা সৃষ্টি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং জীবন মৃত্যু সবকিছু একমাত্র আল্লাহর জন্যেই যেন নিবেদিত হয় তার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরবানী সম্পর্কে সূরা হজ্বের ৩৪নং আয়াতে বলা হয়েছে 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কুরবানীর রীতি প্রবর্তন করেছি যেন তারা আল্লাহ প্রদত্ত জীব জন্তুর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।'

জাহেলিয়াতের যুগে বিভিন্ন দেব দেবীর নামে নযর, নেয়াজ, মান্নত, কুরবানীর রেওয়াজ ছিল। বর্তমান পাক ভারত উপমহাদেশেও ভুয়া উপাস্য দেবীদের বেদিতে বলী দেয়ার প্রচলন বিদ্যমান। কুরআনে জাহেলি যুগের রসম রেওয়াজকে নির্মূল করার জন্য কুরবানীর যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তা অধিক কল্যাণকর। কারন কুরবানীর এ প্রথা মানব মনে এ বিশ্বাস জাগরুক করে যে দুনিয়ার সমুদয় সম্পদ আল্লাহর দান, সমস্ত জীবজন্তু মানব কল্যাণে। তাঁরই সম্পদ থেকে কুরবানী করে প্রমাণ করতে হয় মানুষ জাগতিক সম্পত্তির একচেটিয়া মালিক নহে এগুলো ইচ্ছামাফিক ব্যয় ব্যবহারের অনুমতি নেই। অপরদিকে কুরআনের বাণী 'অর্থাৎ এ থেকে তোমরা নিজেরা খাও এবং স্বচ্ছল ও অভাবী লোকদেরকে খাওয়াও।'

www.nagorikpathagar.org

এ থেকে বুঝা যায় কুরবানীর গোশত উদর ভর্তির জন্য নয় বরং এর মাধ্যমে হাজার হাজার গরীব জনতা চামড়ার অর্থ দ্বারা পুনর্বাসিত হয়। লক্ষ লক্ষ নিঃস্ব মানুষ যারা মাসের পর মাস পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পারে না তারা গোশত খেতে পারে, হাজার হাজার কসাই যবহের পারিশ্রমিক পায় আর রাষ্ট্র বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এটা কি সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়? এ ছাড়াও ইসলামের সামগ্রিক লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ। তা বিভিন্নভাবে করা হচ্ছে যেমন যাকাত দান, ফিতরা, হজ্বে ভুলের কাফফারা, রোযা ভঙ্গের ফিদিয়া, জিহারের কাফফারা, ইলার কাফফারা, হত্যার ফিদিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক যে কাফফারা নির্ধারিত তা কোন ক্ষেত্রে দারিদ্রতা বিমোচনে ইসলামের অনন্য অর্থনৈতিক বিধান। অথচ একশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ একদিকে গরীবদের জন্য মায়া কান্না করছেন অপরদিকে দারিদ্রতা বিমোচনে ইসলামের বিভিন্ন বিধানের সমালোচনা করছেন। এটা তাদের ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাবেরই পরিচায়ক। কুরবানীর মাধ্যমে পশু সম্পদ নষ্ট হচ্ছে এটা, উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারণা। মূলতঃ ইসলাম যেসব প্রাণী কুরবানীর জন্য অনুমোদন দিয়েছে সেসব প্রাণীর বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা আল্লাহ্ই করেছেন। এ সত্যটি তারা কি অস্বীকার করতে পারবেন? অপরদিকে যেসব ব্যক্তিরা মনোরঞ্জনের জন্য প্রতিনিয়ত পশু শিকারে গিয়ে পশুপাখী নিধনকে পশু সম্পদ নষ্ট মনে করেন না। তাদের এ ধরনের চিন্তাধারা বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা প্রসূত নয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে কুরবানী সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তথ্যবই ঃ

১। সাইয়েদ আবুল আ'লা মুওদূদী নির্বাচিত রচনাবলী।

২। আরকানে আরবা।

৩। কুরবানী কি তারিখ

৪। সাপ্তাহিক সোনার বাংলা ২৮ শে মে '৯৩ ঈদুল আযহা সংখ্যা।

www.nagorikpathagar.org

মহরমের শিক্ষাঃ বর্তমান প্রেক্ষিত

মুহাররাম হিজরী সনের প্রথম মাস, মুহাররাম মাস বলতে নিষিদ্ধ মাস বুঝায়। এমাসে রক্তপাত, দাঙ্গা হাঙ্গামা অপরাপর তিনটি মাসের ন্যায় নিষিদ্ধ। যে চারটি মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল এ মাসটি তার অন্যতম, কিন্তু ইসলাম বিরোধীরা এ নিষিদ্ধ মাস সমূহেও যদি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘাতে লিপ্ত হয় সে মুহূর্তে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান আইন সিদ্ধ ছিল।

এ মাসটি ফোরাতের কুলে ন্যায়ের সংগ্রামে শাহাদাত বরণকারী ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর মর্ম বিদারক বিয়োগান্ত ঘটনার স্মারক, আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থে সর্বস্ব ত্যাগের অনুপম দৃষ্টান্ত, যুগে যুগে জালিমের বিরুদ্ধে জুলম উচ্ছেদে আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা যোগায়, এ মাসের দশ তারিখে সুদূর অতীতে অনেক অবিস্মরনীয় ঘটনা সংঘটিত হয়। ১০ তারিখের এ দিনটি আশুরা হিসেবেও পরিচিত। এ মাস সত্য ন্যায় প্রতিষ্ঠা, মিথ্যা ও অসত্য উচ্ছেদের সংগ্রাম করার প্রেরণা দেয়। ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে যেকোন চড়াই উৎরাই মোকাবিলার হিম্মত সৃষ্টি করে। পরকালীন জীবনের সফলতার জন্য দুনিয়ার সকল মায়া বন্ধন ছিন্নের দীক্ষা দেয়।

মুহাররাম মাসে অতীতে অনেক ঘটনা সংঘটিত হলেও সর্বাধিক আবেদনময় বেদনাবহ ও তাৎপর্য মণ্ডিত হয়ে আছে কারবালায় ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর বিয়োগান্ত ঘটনার জন্য। ইমাম হুসাইনের শাহাদাত ইসলামের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক অধ্যায় সৃষ্টি করেছে।

প্রতি বছর মুহাররাম এলে সকল মুসলিম কারবালা ময়দানে বেদনা বিধুর ঘটনার জন্য আন্তরিক দুঃখ বেদনা প্রকাশ করে। কিন্তু ইমাম হুসাইন কিসের জন্য, কোন উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ করলেন? তিনি তৎকালীন সমাজে কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে জীবন উৎসর্গ করলেন? বর্তমান প্রেক্ষিতে মহরমের শিক্ষা কি? আমরা আমাদের সামাজিক জীবনে কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা থেকে কি অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি? ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের ঘটনা আমাদের সার্বিক জীবনে কি দীক্ষা দেয়? এসব মূল্যায়ন খুব কমই হয়ে থাকে। যার কারণে মুহাররামের চাঁদ আমাদের কাঁদায়, কিন্তু সমাজ পরিবর্তনে, জুলম উচ্ছেদে আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা কমই পাই।

হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) ব্যক্তিগত কোন কারণে আত্মত্যাগ, সর্বস্ব কুরবান করেননি। তিনি সালতানাতের দাবীদারও ছিলেন না, ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর সামনে খিলাফাত আলা মিনহাজিন নবুওয়াতের যে চিত্র ছিল, খিলাফাতে রাশেদার থেকে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোকে পরিবর্তনের চক্রান্ত পরিস্ফুট ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র তার আপন বৈশিষ্ট্য থেকে পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণ শক্তি বিনষ্টের সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র ওয়াকিফহাল হয়েই আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদা রক্ষা, আল্লাহর রাসূল কর্তৃক প্রবর্তিত

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল চরিত্র সংরক্ষন, ইসলামের প্রাণশক্তি রক্ষার জন্যই জীবনের সবকিছু ত্যাগে দ্বিধাবোধ করেননি, তাঁর সামনে জীবনের মায়ার চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বাত ও দ্বীনের মায়াই বেশী ছিল। মূলতঃ খিলাফত থেকে মূলকিয়াতের প্রবর্তনই তাঁর আপত্তির কারণ ছিল। কারন খিলাফতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, মারুফ প্রতিষ্ঠা ও মুনকার উচ্ছেদই শাসকের উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু মূলকিয়াতে মানবীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্য জয়, বিলাসী জীবন যাপনই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মারুফের প্রসার ও মুনকার প্রতিরোধ কমই হয়। যার ফলে ইসলামের প্রাণ শক্তি, নেতৃত্বের অপরিহার্য গুন, তাকওয়ার পরিবর্তে চরিত্রহীনতা দেখা যায়। শাসক গোষ্ঠী হালাল-হারামের প্রভেদ করা থেকে দূরে থাকে। তারা আল্লাহকে ভয় করার পরিবর্তে জাগতিক লোভে বেহুশ হয়ে ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দেয়।

"খিলাফাত আলা মিন হাজিন নবুওত" তথা ইসলামী শাসন সাতটি মৌলিক ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইমাম হুসাইন (রাঃ) এ সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করে সংগত কারনে ইমানের অপরিহার্য দাবী পূরণে নিশ্চুপ থাকতে পারেননি। প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেন।

জনগণের মতামতের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচন ও রাষ্ট্রপরিচালনার মৌলিক ধারা পরিবর্তন হয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে 'হুকুমাত' লাভের সিলসিলা কোন ক্রমেই যৌক্তিক ছিলনা। বর্তমান সমাজে আজও গণতন্ত্রের জন্য রক্ত দিতে হচ্ছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামো নিয়ে সংঘাত সংঘর্ষ, প্রাণহানির ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে, যদি কারবালার চেতনায় আমরা বলীয়ান হই তাহলে স্বৈরতন্ত্র মেনে নেয়ার সুযোগ নেই। জনগনকে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। মুহাররমের দশ তারিখে যাঁরাই সমবেদনা জ্ঞাপন করে বানী প্রদান করেন দেখা যায় ক্ষমতায় গেলে স্বাধীন ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে জনগনকে আন্দোলন করতে হয়। ইমাম হুসাইন যে আদর্শের জন্য জীবন দিয়েছেন সে পথ ধরে আজও জীবন দিতে হচ্ছে। জনগনের নিছক স্বাধীন মতামতের জন্যই জীবন দান নয় আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন মতামত দানের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্যই জীবন দান শিক্ষা।

খিলাফতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা কিন্তু মুলকিয়াত প্রতিষ্ঠা হলে তোষামদকারী সভাসদের মাধ্যমে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। পরামর্শ শ্রবন ও গ্রহণের মানসিকতা থাকেনা। বর্তমান বিশ্বে অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে ও বারবার স্বৈরতন্ত্র চালুর প্রেক্ষিতে দ্বন্দ্ব সংঘাত লেগেই থাকছে। সে সকল দেশেও মহররম আনুষ্ঠানিক ভাবে পালিত হয় তাহলে বুঝা যায় কারবালার সত্যিকার চেতনা তাঁরা উপলব্ধি করতে হয়ত ব্যর্থ হয়েছেন কিংবা চেতনা থেকে দূরে অবস্থান করছেন। আমাদের দেশেও ক্ষমতাসীনদের জিদ, হঠকারীতা একগুয়েমীর কারনে অনেক প্রাণহানি ঘটে। এ থেকে পরিত্রান পেতে হলে পরামর্শের ভিত্তিতে শাসন পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

প্রথমতঃ সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে জনসাধারণকে পূর্ণ সুযোগ দানের পরিবর্তে মুলকিয়াতের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে মুখ খুললেই প্রশংসা করতে হবে। সমালোচনার সুযোগ নেই। সুখবাদীতা লোপ পেয়ে চাটুকারীতা সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়তঃ বায়তুল মাল আল্লাহর সম্পদ ও মুসলমানদের আমানত হিসেবে আল্লাহর নির্দেশিত পথ ছাড়া ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই। অথচ রাজতন্ত্রে অর্থাগার শাসকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিনত হয়। বৈধ, অবৈধ সকল ক্ষেত্রে ব্যয় করে। তার হিসেব নেয়ার সাহস কারও নেই। বর্তমান সময়েও দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে হচ্ছে।

তৃতীয়তঃ দেশে কেউ আইনের উর্ধ্বে থাকার সুযোগ ইসলামী খিলাফতে নেই, শ্রমিক থেকে রাষ্ট্র প্রধান পর্যন্ত সবাই আইনের চোখে সমান অথচ এ নীতি পরিবর্তন হয়ে বাদশাহ, গোলাম প্রভেদ সৃষ্টি হল। দূর্বলের জন্য শাস্তি আর ক্ষমতাসীনদের জন্য সবকিছুই মাফ। ন্যায় বিচারক বিচারকদের বিচার বুদ্ধিমত বিচার ফায়সালার এখতিয়ার হ্রাস পেল। এর ফলে বিচারকের দায়িত্ব নিতে সত্য পরায়ন যোগ্য ব্যক্তিরা রাজী হতনা। আজকের সমাজেও আইন আপন গতিতে চলতে দেয়া হয়না। অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি কারাগারে অন্তরীন অথচ অপরাধীরা নির্বিঘ্নে ঘুরছে। রাঘব বেয়ালদের অপরাধ, ক্ষমতাসীনদের অন্যায় নীরবে সহ্য করতে হয়। তাই বর্তমানেও হুসাইন (রাঃ) এর পদাংকনুসরনে শহীদী তামান্নায় উজ্জীবীত হওয়া প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ ইসলামী খিলাফতে মর্যাদার মানদণ্ড তাকওয়া অধিকার ও মর্যাদা সকলের সমান, নৈতিকতা ও চারিত্রিক মাধুর্যতাই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। কিন্তু ইয়াজীদ কর্তৃক রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাহী খান্দান ও অন্যদের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি হয়। আরবী আজমী বিদ্বেষ জাগ্রত হল, সংকীর্ণ দৃষ্টি ভংগী, স্বার্থের দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেল।

আমরা যদি ইসলামী খিলাফতের উল্লেখিত ৪টি বৈশিষ্ট্যকে পর্যালোচনা করি তাহলে সুস্পষ্ট যে ইমাম হুসাইন (রাঃ) এক সুমহান আদর্শের সংরক্ষনের জন্যই জীবন দিয়েছেন, তিনি ইচ্ছে করলে ইয়াজীদ থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা আদায় করতে পারতেন। কিন্তু সে পথ তিনি গ্রহন করেননি। বর্তমান সময়েও জনগনের মতামতের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচনের অধিকার নিশ্চিতকরণ, স্বেচ্ছাচারিতার অবসান, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ক্ষমতাসীনদের জবাবদিহীতা, রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাৎকারীদের বিচার, সর্বত্র আইনের শাসন, সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার সমভাবে নিশ্চিত করার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে। শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রে উল্লেখিত দাবীতে জনগন সোচ্চার। অপরদিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর জনতার উপর সর্বত্রই নির্যাতন চলছে। মিশর, ফিলিস্তীন, আলজেরিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশ প্রকৃষ্ট উদাহরণ, বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পাক ভারতীয় উপমহাদেশে ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদদপুষ্ট স্বৈরাচারী ক্ষমতাসীন মহল ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োগের মাধ্যমে অব্যাহত অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করতে চায়। ইসলামের কথা বলার অপরাধে পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। তাহলে মহররমের আবেদন কি ক্ষমতাসীনদের নিকট নিছক আলোচনা, বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ? মহররমের শিক্ষা যদি সকলেই গ্রহণ করত, তাহলে অন্তত মুসলীম বিশ্বের কোথাও গণতন্ত্রের জন্য জীবন দিতে হতোনা। রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাতের দায়ে ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতা হারানোর পর দূর্নীতির দায়ে কারারুদ্ধ হতে হতোনা। আইনের শাসনের অভাবে 'জোর যার মুল্লুক তার' এ নীতি অনুসৃত অবকাশ কেউ পেতোনা। রাষ্ট্রপ্রধান যাবতীয় আইনের উর্ধ্বে তিনি ইচ্ছে করলে খুনী শাস্তি প্রাপ্ত আসামীকে মাফ করার সুযোগ পেয়ে অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধি পেতনা।

হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদাতের ফলে ইসলামী চেতনায় উজ্জীবীত হয়ে সকল যুগে সত্য, কল্যাণ, হক, ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় আত্মোৎসর্গ করার প্রেরণা পাওয়া সম্ভব হল। তিনি যদি আপোষ করতেন, কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক পরিবর্তনের পদক্ষেপ দেখেও টু-শব্দ করা থেকে বিরত থাকতেন তাহলে ইসলামের ইতিহাস ভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ হত। এ কারণেই বলা হয় 'ইসলাম জিন্দা হোতা হায় হার কারবালা কে বাদ' আজকের প্রেক্ষাপটে ঈমানী চেতনা নৈতিক মনোবল, শহীদী তামান্না নিয়ে জুলুম উচ্ছেদে জালিমের বিরুদ্ধে সাহসী ভূমিকা প্রয়োজন। বর্তমান যুগে স্বৈরাচারী, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী শক্তি যেভাবে ইসলাম নির্মূলের চক্রান্তে লিপ্ত মুসলিম উম্মাহকে সিংহ শার্দুলের ন্যায় গর্জে উঠতে হবে। মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষন ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণেই সাহসী ভূমিকা প্রয়োজন। মানবতা, মানবিক মূল্যবোধ যেখানে ধ্বংস হতে থাকে, ইসলামের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়, মুসলমানদের স্বাধীন অস্তিত্ব বিপন্ন প্রায় সেখানে মহররম শিক্ষা দেয় জীবনের মায়াকে ত্যাগ করে দ্বীনের মর্যাদা রক্ষার, মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সর্বশক্তি নিয়োগের জন্য।

বর্তমান সময়ে 'গণতন্ত্রের জন্য' আন্দোলনকে নিছক রাজনৈতিক আখ্যা দেয়ার প্রবনতাও বিদ্যমান। কিন্তু এ আন্দোলন যে স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করার জন্য তা অনেকেই উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন না। অথচ ইমাম হুসাইনের শাহাদাত জোর করে ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়েই হয়েছিল। বর্তমান সমাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে 'খিলাফাত আলা মিনহাজিন নবুওতের' অনুকরনে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা প্রয়োজন। যারা আল্লাহকে ভয় পায়, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করে, তাদের কাছে জাগতিক ক্ষমতা বড় নয় আল্লাহর রেজামন্দি হাসিলই মূল। তাই তারা স্বৈরাচারী হয়না, জনগনের সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করেনা, ন্যায় বিচার, আইনের শাসন, সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ করে।

www.nagorikpathagar.org

হজ্বের গুরুত্ব ও শিক্ষা

হজ্ব ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের অন্যতম। Encyclopedia of Religion-এ বলা হচ্ছে। It is the fifth piller of Mohammadan practical religion and anim combent religious duty founded upon express injunction in the Quran. আরবী অভিধানে হজ্বের শাব্দিক অর্থ ইচ্ছা, অভিপ্রায়, কোথাও গমন করা, কোন পবিত্র ঘর যিয়ারতের ইরাদা উল্লেখ করা হয়েছে। Arabic and English dictonary গ্রন্থে piligrimage to macca, to visit the holy land or sacred place. হজ্বের অর্থ বলা হয়েছে। ফিকহুসসুন্নাহ গ্রন্থে তাওয়াফ, সায়ী উকুফে অরাফাসহ আবশ্যকীয় বিধানাবলী পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পবিত্র মক্কা যিয়ারতকে হজ্ব বলা হয়েছে। ডঃ ইব্রাহীম বলেন, হজ্ব ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ইবাদত পালনের জন্য খানায়ে কাবার যিয়ারতের নামই হজ্ব। আল্লামা আবুবকর যাযায়েরী বলেন, বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করা এবং প্রয়োজনীয় ইবাদত করা হজ্ব। মূলতঃ নির্দিষ্ট কতিপয় ইবাদত সহকারে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানের যিয়ারত করাও প্রশিক্ষণ নেয়াকে হজ্ব বলে।

আল্লাহ যেসব ইবাদতকে ইসলামের ভিত্তি (বুনিয়াদ) হিসেবে উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে হজ্ব অন্যতম। কিন্তু এটা সকলের উপর ফরজ নহে। প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন, সুস্থ, সবল, মক্কায় যাতায়াতের আর্থিক সংগতি সম্পন্ন ব্যক্তি, চলাচলের পথ নিরাপদ থাকলে পরিবারের প্রয়োজনীয় ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলে তার উপর হজ্ব ফরজ। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মেও তীর্থ ক্ষেত্রে গমনের প্রচলন রয়েছে। কখন হজ্বের প্রবর্তন হয়েছে এ সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে এতটুকু জানা যায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রচলন করে। যদিও কাবাগৃহ আল্লাহর ইবাদতের জন্য সর্বপ্রথম গৃহ। আল কুরআনে বায়তুল আতীক (পুরাতন গৃহ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দুনিয়ার প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম এই কাবাগৃহ নির্মাণ করেন। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও কাবাগৃহ কেন্দ্রিক আরবদের ধর্মীয় উৎসব হতো। প্রতি বছর তারা কাবাগৃহ যিয়ারত করত। তারা এখানে মিলিত হয়ে নিজেদের পূর্ব পুরুষদের গুণকীর্তন, বীরত্ব গাঁথা বর্ণনায় লিপ্ত হত। মানাত দেবীর পূজা, উলংগ হয়ে কাবা যিয়ারত করত। এভাবে অনেক অপকর্মে জড়িয়ে পড়ত। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর সব দেব দেবী কাবা ঘর থেকে অপসারিত হয়। জাহেলী রসম নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। রাসুল (সাঃ) সে বছর ওমরাহ হজ্ব পালন করেন। নবম হিজরীতে হজ্ব ফরজ হওয়ার পর নবী (সঃ) ব্যস্ততার কারনে যেতে পারেননি (বিশুদ্ধ মতানুযায়ী) সে বছর হযরত আবুবকর (রাঃ) কে হজ্বে প্রেরণ করা হয়। রাসূল করীম (সাঃ) ১০ম হিজরীতে হজ্বের নেতৃত্ব দেন। এটিই বিদায় হজ্ব নামে খ্যাত। হজ্ব প্রথম ফরজ হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর যিলহজ্ব মাসে হজ্ব অনুষ্ঠিত

www.nagorikpathagar.org

হয়। হজ্বের আসল অনুষ্ঠানগুলি ৮ যিলহজ্ব হতে ১৩ যিলহজ্বের মধ্যেই সম্পন্ন করা হয়। বিশ্বের প্রতিটি দেশ থেকে কম বেশী হজ্বে গমন করেন। লাখ লাখ মুসলিম নর-নারীর মহা সম্মিলন হয়। আরাফাতের ময়দানে বিশাল সমাবেশ ঘটে। পূণ্যভুমি মক্কা নগরী মুখরিত হয়ে উঠে লক্ষ কণ্ঠের আবেগ জড়িত লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক---ধ্বনিতে। ধুসর মরুময় মক্কার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় তালবিয়া। পার্থিব জীবনের কোন লোভ লালসা নয়। নয় কোন আশা প্রত্যাশা, কফিন সদৃশ পোশাকে এহরাম পরিহিত লক্ষ কণ্ঠের একই অওয়াজ হে আল্লাহ আমি হাজির। মহান রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভে বিশ্ব মুসলিমের মহামিলন ঘটে।

কিন্তু বর্তমানে একশ্রেণীর ব্যক্তি মুক্ত বুদ্ধি চর্চার নামে বলে বেড়াচ্ছেন হজ্ব অর্থ অপচয় বৈ কিছুই নয়। তারা হজ্বের উদ্দেশ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিস্মৃত হয়ে এসব প্রলাপ করছেন। অথচ হজ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক গুরুত্ব

হজ্বের সামজিক গুরুত্ব অপরিসীম। দুনিয়ার জন্য কোন অনুষ্ঠানে সামাজিক বৈষম্য দূর করার এমন সুন্দর ব্যবস্থা নেই। মাওঃ মোহাম্মদ আলী The Religon of Islam গ্রন্থে উল্লেখ করেন– No other instituton in the world has distnction of one, colour and meet togather before the holy house of God as his servants as members of are divine family. But they are all coiled in one dress in two white speets and three remians nothing to distinguis the high from low. অর্থাৎ বংশ, বর্ণ ও পদ মর্যাদার সকল পার্থক্য দূরীভূত করার এমন সুন্দর প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে আর নেই। এক অখণ্ড খোদায়ী পরিবারের অন্তর্ভূক্ত মানব, আল্লাহর বান্দা হিসেবে আল্লাহর ঘরের সম্মুখে সকল দেশের ও জাতির মানুষ এসে সমবেত হয়। শুধু তাহাই নহে বরং তারা একই পোষাক পরিধান করে এবং তাদের মধ্যে শুধু উঁচু-নিচুর পার্থক্য করার কোন সুযোগ থাকে না। অধ্যাপক হিট্টি বলেন, 'পৃথিবীর চতুর্দিক যে বিশ্ববাসীদের ভ্রাতৃত্বের এরূপ আন্দোলনের সামাজিক প্রভাবকে অতিরঞ্জিত করা সম্ভব না। এটি নিগ্রো, বর্মা, পারসিক, তুর্কী, মিশরী, আরবী, আজমী, ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু সবাইকে ধর্মের অসাধারণ মঞ্চে একত্রিত হবার প্রেরণা দেয়। ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আলী বলেন, 'No other Institution in the world have the wonderful influence of the Hajj in leveling all distinction of race, colour and rank. অর্থাৎ বংশ, বর্ণ ও পদমর্যাদার সকল বৈষম্য দূর করে সব মানুষের সাম্য বিধানের ব্যাপারে হজ্বের শক্তিশালী প্রভাব অন্য কোন বিধানে নেই। Muslim News International এ উল্লেখ করা হয়েছে।

A most Important goal of pillgrimage is the assembling of

www.nagorikpathagar.org

Muslim from different parts of the world. They learn to understand one another and know the needs of Muslim Countries other then their own. উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে হজ্বের সামাজিক প্রভাব অনেক।

১। হজ্বের মাধ্যমে সুন্দর সমাজ গড়ার প্রশিক্ষণ অর্জিত হয়।

২। হাজ্বীগণ একতা ও শৃংখলার ট্রেনিং গ্রহণ করে। একই পদ্ধতিতে এহরাম বাঁধে তাওয়াফ, তালবিয়া, প্রস্তর নিক্ষেপ, অকুফেআরাফা প্রভৃতি কাজ সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন করে।

৩। ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, হাজ্বীগণ পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, আবহাওয়া, রীতিনীতি সম্পর্কে জ্ঞাত হয়।

৪। বৈষম্য দূরীভূত হয়। পারস্পরিক সৌহার্দ, ভালবাসা ও প্রীতিময় সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

৫। সাংস্কৃতিক কিছু কর্মকান্ড পরিলক্ষিত করার সুযোগ পায়।

ধর্মীয় গুরুত্ব

যেসব ইবাদত করার জন্য কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ এসেছে তা তিন প্রকারঃ

১. ইবাদত বদনী দৈহিক ইবাদত, ২. ইবাদতে মালী- আর্থিক ইবাদত, ৩. ইবাদতে মালী ও বদনী - আর্থিক ও দৈহিক সমন্বিত ইবাদত।

নামাযের সাথে দৈহিক সম্পর্ক, যাকাতের সাথে আর্থিক সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু হজ্বের সাথে দৈহিক ও আর্থিক উভয় ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান, এদিক দিয়ে চিন্তা করলে হজ্ব গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন ও হাদীসে হজ্ব সম্পর্কে অনেক বর্ণনা এসেছে।

১. সূরা আল ইমরানের ৯৭নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে 'মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাবাঘরের হজ্ব করা ঐ সমস্ত মানুষের উপর ফরজ যারা ঐ পর্যন্ত অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখে। আর যারা কুফরী করবে (অর্থাৎ সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্ব করবে না।) তারা জেনে রাখুক আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নহেন।' এ আয়াতের মাধ্যমে যাদের সামর্থ রয়েছে তাদের হজ্ব করা আল্লাহর নির্দেশ।

২. সূরা হজ্বের ২৬-২৮ আয়াতে বলা হয়েছে এবং স্মরণ কর যখন ইব্রাহীমের জন্য এ ঘরের স্থান নির্ধারিত করে দিয়েছিলাম একথা বলে যে আমার সাথে কোন শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখো তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা দাঁড়ায় রুকু করে এবং সেজদা করে। মানুষের নিকট হজ্ব এর ঘোষণা করে দাও তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীনকায় উটসমূহের পিঠে এরা আসবে দূর দূরান্ত পথ অতিক্রম করে। এখানে এসে তারা যেন দেখতে পায় তাদের জন্য দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণের কত সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর দেয়া জন্তুগুলোকে আল্লাহর নামে কুরবাণী করবে, অতঃপর তোমরা তা হতে আহার কর এবং দুস্থ অভাবগ্রস্তদের আহার করাও।'

www.nagorikpathagar.org

৩. সূরা আলবাকারা ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, এবং সেই সময়কে স্মরণ কর যখন কাবাগৃহকে মানব জাতির মিলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে সালাতের স্থান রূপে গ্রহণ কর এবং ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে তাওয়াফকারী ইতেকাফকারী, রুকু ও সেজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম'।

৪. হাদীস শরীফে এসেছে যিনি খালেস নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্বব্রত পালন করেন তিনি সদ্যজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যান।

৫. বুখারী শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ আছে রাসূল কারীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন 'যার উপর হজ্ব ফরজ করা হয়েছে আর সে যদি হজ্ব না করে আমি কি বলতে পারি না যে সে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মচ্যুত হয়ে মরবে অর্থাৎ সে ব্যক্তি বেঈমান হয়েও মরতে পারে। হযরত আবু হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য খাঁটিভাবে হজ্বব্রত পালন এবং যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকল সে এমন নিষ্পাপ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করল যেন সে দিনই জন্মগ্রহণ করেছে।

৬. হযরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত 'তোমরা হজ্ব ও ওমরার পিছনে লেগে যাও এ দুটে গুনাহকে দূরীভূত করে।'

৭. অপর হাদীসে রয়েছে 'হজ্বে মাবরুরের সওয়াব হচ্ছে জান্নাত। কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত বাণীসমূহ থেকে যেসব বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল তা হচ্ছে–

১. হজ্ব আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রয়োজন।

২. হজ্বের মাধ্যমে পাপ মোচন হয় পানি যেমন আবর্জনা ধুয়ে পরিস্কার করে দেয়। হজ্বও অদ্রুপ গুণাহ বিদূরিত করে পরিস্কার করে দেয়।

৩. হজ্ব যাদের উপর ফরজ তারা আদায় না করলে কঠিন জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে।

৪. হজ্বের মাধ্যমে দৈহিক আর্থিক ও মানসিক ইবাদত হয়।

৫. নিষ্ঠা, তাকওয়া, ত্যাগের মানসিকতা, নম্রতা, আনুগত্য, নফসের বাসনা দমন প্রভৃতি গুণ সৃষ্টি হয়।

আধ্যাত্মিক গুরুত্ব

হজ্বের আত্মিক দিকগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হজ্ব নিছক ভ্রমণ নয়। এর মাধ্যমে আত্মিক উৎকর্ষের পথ সুগম হয়। আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জিত হয়। খানায়ে কাবার যিয়ারত হাজ্বীদের মনে আল্লাহর প্রতি গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করে। অকুফে আরাফা, সায়ী হলক প্রভৃতির মাধ্যমে আত্ম সমর্পিত মুসলিম মানসে ঈমানের গভীর ভাবধারা সৃষ্টি হয়। মীনায় নহরের দিন, পশু কুরবাণী স্মরণ করিয়ে দেয় হযরত ইব্রাহীমের খোদা প্রেমের কঠিন ঘটনা, যমযমের পানি পানে হাজ্বীগণ পরিতৃপ্ত হয় এবং স্মরণ করেন হযরত হাজেরার আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের গভীর

www.nagorikpathagar.org

চিত্র। হাজীগণ অহুদ বদর সহ ঐতিহাসিক স্থানগুলো যিয়ারতের সুযোগ লাভ করতে পারে। যার মাধ্যমে ইসলামী ভাবধারা হৃদয়ের গভীরে রেখাপাত করে। হাজীগণ নিজের স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে নিজের আবল্য স্মৃতি বিজড়িত জন্মভূমির মায়া দূর করে আর্থিক ত্যাগ ও ভ্রমনের কষ্ট সহ্য করে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছুটে ধুসর মরুভুমিতে। হজ্ব করে এলে মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, শঠতা প্রভৃতি থেকে দূরে থেকে ক্রমবর্ধমান গতিতে উচ্চতর আধ্যাত্মিকতা লাভ করে। আল্লাহর নিকটবর্তী হতে সদা পূণ্য কাজে লিপ্ত থাকে By spiritual awaking it means that Hajj is very much meaningful and signficant in muslim life. অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জাগরন দ্বারা ইহা বুঝায় যে হজ্ব মুসলমানদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হজ্বের সময় হাজ্বীগণ আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে থাকেন, আল্লাহ নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত থাকেন। সব সময় তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর মহান সৃষ্টি কর্মের প্রশংসা করেন এবং শেরেকমুক্ত জীবন যাপনের দীক্ষালাভ করেন।

রাজনৈতিক গুরুত্ব

বর্তমানে দ্বন্দ্ব সংঘাত সবখানে, বর্ণে বর্ণে, দেশে দেশে সর্বদাই অশান্তির দাবানল জ্বলছে। একটি মুসলিম দেশের অভ্যন্তরে নিজেদের বিভিন্ন দল উপদলে কোন্দল সংঘাতে প্রাণহানি ঘটছে লাখ লাখ মুসলমানের। হজ্বের প্রকৃত শিক্ষা উপলব্ধি করে বাস্তব জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাত কমিয়ে আনা সম্ভব। হজ্বের শিক্ষা আমাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে অনেক ব্যবধান কমিয়ে দেয়। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত করে সংকীর্ণতা চিরতরে হৃদয় মন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। প্রফেসর পি, কে হিট্টি তার Histoty of the Arabs গ্রন্থে বলেন "Of all world religions Islam seems to have attained the largest measure of success in demolishing the barriers of race, colour and nationality at least within the countries of its our community. বস্তুগত হজ্বের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় হয়, পারস্পরিক দূরত্ব দূরীভূত করে, সম্প্রদায়গত পার্থক্য নস্যাত করে। হজ্বের বিশ্ব সম্মিলনে প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলী পর্যালোচনার সুযোগ পায়। নিজেদের মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝি দূর করতে সক্ষম হয়। যার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সমস্যাবলী চিহ্নিত করা যায়, মুসলিম বিশ্ব নিয়ে যারা চক্রান্ত করছে তাদের চক্রান্ত নস্যাতে বিশ্ব মুসলিম জনমত সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশের করণীয় নির্ধারণে সহায়ক হয়।

হজ্বের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

যুগ যুগ ধরে কাবাঘর কেন্দ্রিক, প্রতিবছর আন্তর্জাতিক বাজার বসে। বিভিন্ন দেশের নানা ধরনের দ্রব্য সামগ্রী সেখানে বেচাকেনা হয়। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে

www.nagorikpathagar.org

হজ্বে গমন ঠিক নয় কিন্তু হজ্বের আবশ্যকীয় সকল কর্ম সম্পন্নের পর কেনা বেচা বৈধ। মুসলিম বিশ্ব পরিকল্পিত উপায়ে এটাকে 'ইসলামী আন্তর্জাতিক কমন মার্কেটে' পরিগণিত করতে পারে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারিত করতে পারে। Abdullah Al Masud সুপ্রসিদ্ধ Muslim News International জার্নালে বলেন, On the other hand a permanent pan Islamic Exhibition during the Hajj will be a much more Economical proposition for introducing the product of the muslim Countries of the world. হজ্বের সময় আন্তর্জাতিক ইসলামী বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে যেসব অমুসলিম রাষ্ট্র মুসলিম দেশের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত তাদের পণ্য বর্জনের মাধ্যমে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবেও চাপ প্রয়োগ সম্ভব। এ ছাড়া প্রতিবছর ২০/২৫ লক্ষ মুসলিম হজ্ব করেন। তাদের জবাইকৃত পশুর চামড়া পরিকল্পিতভাবে বিক্রির মাধ্যমে দুস্থ পরিবার পুনর্বাসনে আন্তর্জাতিকভাবে একটি সংস্থার মাধ্যমে এ ফান্ড থেকে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করা যেতে পারে। হজ্বের সময় জবাইকৃত পশুর অবশিষ্ট গোশত পরিকল্পিতভাবে গরীব মুসলিম দেশে বিলি করা যায়। মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে হজ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

হজ্বের শিক্ষা

হজ্ব একাধারে দৈহিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক ইবাদত। এর মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনা সম্ভব। হজ্বের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য মূল্যায়ন করে যেসব শিক্ষা অর্জন করতে পারি তা হচ্ছেঃ

১। ইহ্‌রামের সময় সাদা সেলাই বিহীন দুটুকরো কাপড় পরিধান একদিকে অহংকার দূর করে অপরদিকে মৃত্যুর সময়ের কফিন পরার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

২। হজ্বের আহকামগুলি একই পদ্ধতিতে পালন, একই ধরনের পোশাক পরিধান এ কথারই ইঙ্গিত দেয় যে, সকল মুসলমান ভাই ভাই, সকলেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মাত।

৩। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দেশের মধ্যকার ভেদাভেদ দুর করে সাম্য, প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়।

৪। বিশ্ব মুসলীম ঐক্য, সংহতি, সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করে।

৫। মুসলিম জাতির পিতা হিসেবে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

৬। লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইকের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক দর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

৭। পরিশ্রম, কষ্ট, সহিষ্ণুতা ও ত্যাগের অনুপম শিক্ষা ফুটে উঠে।

৮। ঐতিহাসিক বদর, ওহুদ, খন্দক, তাবুকের স্থান সমূহ দর্শনের মাধ্যমে

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী ভাবধারা সৃষ্টি হয় এবং যে কোন কঠিন মুহূর্তে দ্বীনের পথে অটল থাকার দীক্ষা দেয়।

৯। সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। অনেক মুসলিম রাষ্ট্র এখনও যুদ্ধ বিগ্রহে অমুসলিম দেশ থেকে সৈন্য সহযোগিতা নিতে চেষ্টা করেছেন এটা হজ্বের শিক্ষার পরিপন্থি। যদিও প্রয়োজনে সামরিক সহযোগিতা নেয়া বৈধ, তবুও সকল মুসলিমকে ন্যূনতম সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হবে দ্বীন কায়েম করার জন্য কিংবা দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য।

১০। মুসলিম বিশ্বে পারস্পরিক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে ইসলামী অর্থনৈতিক কমন মার্কেট সৃষ্টির শিক্ষা নেয়া হয়।

১১। নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে জাতিগত, বর্ণগত ও সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ ভুলে সকল মুসলিম একই উদ্দেশ্যে কাজ করার শিক্ষা পাওয়া যায়। এক ইমামের পিছনে এক কেবলামুখী হয়ে নামায, এক ধরনের পোশাক, একই ভাষায় তালবিয়া পাঠ, একই নিয়্যতে হজ্বের আহকাম পালনের মাধ্যমে।

উপসংহারে Pr. Hurgonic এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তার মতে The Ideal of a league of human races has been indeed approached by Islam more nearby than by any other religion. For the all of nations landed on the bests of all human races so seriously as to put other communities to shame.

পরিশেষে বলা যায় প্রেম ও একতার জন্য হজ্ব ফরজ করা হয়েছে, কিন্তু সেই প্রেম-প্রীতি ভালবাসা হারিয়ে মুসলমানগণ নিজেরা পরস্পরে সামান্য স্বার্থে যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত। ইসলামী আদর্শের অনুপস্থিতি সর্বত্রই। ইসলামের বিভিন্ন ইবাদতকে অনুষ্ঠান সর্বস্ব উৎসব হিসেবে পালন করা হচ্ছে। নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃতির মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যে গুরুত্ব রয়েছে তা সকলেই বিস্মৃত।

তথ্য বই ১। মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস ২। আরকানে আরবা ৩। শরহে বেকায়া ৪। মেশকাত শরীফ ৫। হজ্বের হাকীকত।

www.nagorikpathagar.org

মাহে রমজানের ফজীলত ও গুরুত্ব

রমজান শব্দটি রমজ শব্দ হতে উৎপত্তি, শাব্দিক অর্থ দহন, যেহেতু রোজা অসৎ প্রবৃত্তি দহন করে তাই রোজার মাসকে মাহে রমজান বলা হয়। মাহে রমজানের ফজীলত কোরআন ও হাদীসে অনেক বর্ণিত হয়েছে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) রমজান মাসের শুরুতে এবং শাবান মাসের শেষতম দিবসে এরশাদ করেন- 'হে মানব সকল, একটি মহান বরকতময় মাস তোমাদের উপর ছায়ারমত এসেছে ইহা এমন মাস যাহার এক রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম' (মেশকাত) অন্য হাদীসে এসেছে, 'এই মাসে নফল নামাজের ছওয়াব অন্যান্য মাসের ফরজ নামাজের সমতুল্য , এমাসের একটি ফরজ অন্য মাসের সত্তরটি ফরজ আদায় করার সমান সওয়াব পাওয়া যায়,' অতএব এ মাসে নফল ইবাদত বেশী করা প্রয়োজন। রাসূলে কারীম (সাঃ) অন্য হাদীসে বলেন' 'বেহেশতের আটটি দরজা আছে, তার একটির নাম রাইয়ান বা তৃপ্তি, রোজাদারগণই এই দরজা দিয়ে বেহেশতে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করবে।' রমজান মাস অতি পবিত্র মাস। এ মাসে আল্লাহ্ তায়ালা বেহেশতের দরজা খুলে দেন এবং দোজখের দরজা বন্ধকরে দেয়া হয়। রোযা মুমীনদের জন্য ঢাল স্বরূপ। যাহা ইহকালে মন্দ হতে দূরে রাখে এবং পরকালে দোজখের আগুন হতে রক্ষা করে। কিয়ামতের দিন রোজাদারের জন্য রোজা সুপারিশ করবে তার মুক্তির জন্য। এ মাস এমন মোবারক যার প্রথম ভাগে আল্লাহর রহমত, দ্বিতীয় ভাগে গুনাহ্ থেকে মাপ, এবং শেষ ভাগে দোজখের আগুন থেকে মুক্তির সুসংবাদ রয়েছে। এভাবে রমজানের রোজার অনেক ফজীলতের বর্ণনা এসেছে।

রোজার এই ফজীলত প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন, 'কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য-এই ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করা। মানুষের উন্নতির পথে এগুলো অন্তরায়। আল্লাহর রাসুল বলেন, "যে রোজাদার মিথ্যা কথা ও অসৎ কাজ ছাড়তে পারে না, তার খানাত্যাগ আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই" অন্যত্র বলেন এমন অনেক রোজাদর আছে যাদের রোজার ফলে ক্ষুধার্থ ও পিপাসাকাতর হওয়া ছাড়া অন্য কোন লাভ হয়না।" এজন্য রোজাদার কে সতর্ক থাকতে হবে ব্যক্তি মানুষ এর উপর রিপুর প্রভাব যেন বেশী পড়তে না পারে। আমাদের সমাজে রমজান মাসেও অনেক খারাপ কাপ রিপুর তাড়নায় সংঘটিত হয়। অথচ রোজা ফরজ করা হয়েছে রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

নফস বা দেহের তিনটি মুলদাবী ঃ ক্ষুনিবৃত্তি, যৌন আবেগ, শান্তি ও বিশ্রাম গ্রহণের দাবী। এ তিনটি দাবী নিজ সীমা অতিক্রম করলে খুদীকে দাসে পরিনত করে। ফলে ক্ষুন্নিবৃত্তি পেটের দাসবানায়। যৌন ক্ষুধা পশুর চেয়েও নীচে নামায়। বিশ্রাম প্রিয়তা ইচ্ছাশক্তি লোপ করে। যার কারণে খুদী" নফসের শাসক থাকে না বরং গোলামে পরিনত হয়। কিন্তু রোজা নফসের এই তিনটি বিষয় কে নিয়ন্ত্রিত করে ফলে খুদী প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করে। যার কারণে মানসিক শক্তি

www.nagorikpathagar.org

বৃদ্ধি ও আত্মিক উন্নতি হয়। এসব কিছু লাভ হয় মাহে রমজানের 'রোজা' পালনের মাধ্যমে। রমজান মাস ২৯ কিংবা ৩০ দিনের, যেমনি আরবী অন্যান্য মাস হয়ে থাকে। কিন্তু রমজান মাসের এত ফজীলত ও বিশেষত্ব কেন?

সূরা আল বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে এর জবাব পাওয়া যায়- আল্লাহ বলেন, 'রমজান সেই মাস যাহাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। যে কুরআন মানব জাতির পথ প্রদর্শক এবং সঠিক পথের নির্দশন সমূহ যাতে প্রদত্ত হয়েছে, যাহা সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী।'

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল 'মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাজিলের কারণেই রমজান মাসের এত বিশেষত্ব। অতএব কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য আমাদেরকে জানতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে।

তাওরাত লাভের পূর্বে হযরত মুসা (আঃ) ৪০ দিন রোজা পালন করেন তুর পাহাড়ে। হযরত ঈসা (আঃ) ইঞ্জিল লাভের পূর্বে দীর্ঘ ৪০ দিন অনুরূপ সাধনা করেছিলেন। হযরত আদম থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ রোজা ফরয ছিল। ইহাকে বলা হতো "আইয়ামেবীজ"। ইহুদীদের প্রতি সপ্তাহে শনিবার, বছরের মধ্যে মহরমের দশম তারিখে এবং মুসার স্মৃতির স্মরণে ৪০ দিন রোজা পলনের নির্দেশ আছে। খ্রীষ্টানদের উপর যে ৪০ দিন রোজা ফরজ তাহাকে ফণর্ভ বলা হয়। ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও একাদশীর উপবাস পালন করে। এ থেকে বুঝা গেল রোজা শুধু আমাদের উপর ফরয নয় পূর্ববর্তীদের উপরও ফরজ ছিল। সূরা বাকারার ১৮৩ ও ১৮৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'হে মুমীনগণ তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগনের উপর। আশা করা যায় তোমরা খোদাভীতি অর্জন করতে পারবে।' রোজার মাধ্যমে তাকওয়ার যে অনুশীলন হয় তা মানুষের ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনে আমুল পরিবর্তন সাধন করে। মানুষ একমাত্র আল্লাহর ভয়েই পানাহার ও যৌনাচার থেকে নির্দিষ্ট সময় বিরত থাকে। আল্লাহর ভয় হৃদয়ে সৃষ্টি হলে যে কোন অন্যায় থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, যেহেতু পাশবিক বাসনার প্রাবল্য ফেরেশতা সুলভ চরিত্র অর্জন ও তাকওয়া মন্ডিত জীবন যাপনের পথে অন্তরায়, সুতরাং ইহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত, এই উপকরণগুলিকে পরাভূত করে পাশবিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ রাখা রোজার মাধ্যমেই সম্ভব।

তথ্যপঞ্জী (১) নামায রোজার হাকীকত– সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী।
(২) বায়ানুল কুরআন– মাওঃ আশরাফ আলী থানভী।
(৩) শাহওয়ালীউল্যাহ দেহলবী রচিত গ্রন্থাবলী।
(৪) চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রোজা– ডাঃ দেওয়ান এ কে এম আব্দুর রহীম।

www.nagorikpathagar.org

রোজার তাৎপর্য ও শিক্ষা

রোজা ফার্সী শব্দ। শাব্দিক অর্থ উপবাস, আরবী প্রতিশব্দ 'সওম' অর্থ বিরত রাখা, বারন করা বা ফিরিয়ে রাখা। ইসলামের পরিভাষায় 'সুবহি সাদিক হতে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন ধরনের পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকার নাম রোজা।' রোজা ইসলামের পঞ্চ ভিত্তির অন্যতম। দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে মুসলমানদের উপর রোজা ফরজ করা হয়।

এখন বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, রোজার উদ্দেশ্য কি? জীবনের উপর তার প্রভাব কি? গোটা রমজান মাস ৭২০ ঘন্টা সিয়াম সাধনার অনুশীলনের পর শাওয়ালের প্রথম তারিখেই ইবাদতের সকল প্রভাব বিলুপ্ত হয় কেন? ইহার মূল কারণ, রোজার উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যর্থতা। তাই চিন্তা করা প্রয়োজন, রোজার আসল উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন সুরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন, 'হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়ার গুন অর্জন করতে পার। এ আয়াত থেকে বুঝা গেল রোজার উদ্দেশ্য শুধু না খেয়ে কষ্ট পাওয়া নয়, আসল উদ্দেশ্য মানুষের মাঝে তাকওয়ার গুন সৃষ্টি করা। এর সমর্থনে আল্লাহর রাসূল বলেন, 'এমন অনেক রোজাদার আছে কেবল ক্ষুধা আর পিপাসা ছাড়া যাহার ভাগ্যে অন্য কিছুই জোটেনা।' ইহা দ্বারা ভালরূপেই বুঝা যায় শুধু ক্ষুধার্ত ও পিপাসায় কাতর থাকা ইবাদত নয় বরং 'আল্লাহকে ভালোবেসে সেই সব কাজ ঐকান্তিক আগ্রহের সাথে পালন করাই ইবাদত।' এজন্য রোজা রাখিয়া বেশী পরিমান নেক কাজ করা উচিত।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রোজার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেন 'সিয়ামের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার পাশবিক ইচ্ছা ও জৈবিক অভ্যাস থেকে মুক্ত করা এবং জৈবিক চাহিদা সমুহের মধ্যে সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠা করা। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জন করে। চিরন্তন জীবনের অনন্ত সফলতার স্বর্ণ শিখরে আরোহন করে। পশুত্ব নিস্তেজ হয়ে মনুষত্ব জাগ্রত হয়। দারিদ্র পীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে। রোজা মানুষের শারীরিক ও আত্মিক শক্তির উন্নতি সাধন করে। পাশবিক চাহিদার প্রাবল্য যা মানুষের স্বাস্থ্য ধ্বংস করে তা থেকে রোজা মুক্তি দেয়। কলবের ইসলাহ ও চরিত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে সিয়াম কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

ইমাম গাজালী এহইয়াউলউলুম গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২১২ পৃষ্টায় লিখেন, 'আখলাকে ইলাহী তথা ঐশ্বরিক গুনে গুনান্বিত মানুষকে ফিরিশতাদের অনুকরনের মাধ্যমে যতদূর সম্ভব নিজকে প্রবৃত্তির গোলামী থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা দেয়।' কিন্তু মানুষের মাঝে সহজাত এমন কিছু প্রবৃত্তি আছে যা বাঁচার জন্য প্রয়োজন। যেমন খাঁদ্য গ্রহন প্রবৃত্তি, আত্ম প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি, ক্রীড়া প্রবৃত্তি, যৌন প্রবৃত্তি, বিশ্রাম প্রবৃত্তি ইত্যাদি। প্রত্যেক প্রানীই এসব প্রবৃত্তির চরিতার্থ চায়। কোন প্রানী এসব প্রবৃত্তি চরিতার্থের বেলায় বাধা নিষেধ মানতে চায় না। কিন্তু মানুষকে এসব প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রন করতে হয়। কারন অন্যান্য প্রানীর বিবেক বোধ নেই, তাই তারা ইচ্ছাধীনভাবে সহজাত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। কিন্তু মানুষকে বিবেক দেয়া হয়েছে তাই ইচ্ছা শক্তিকে নিয়ন্ত্রন করতে হয়। যেমন

www.nagorikpathagar.org

অন্যান্য প্রানীর খাবার চাহিদা হলে সামনে পেলেই খায়। কিন্তু মানুষকে চিন্তা করতে হয় আমি যা খাব তা হালাল কিনা? তা খাওয়ার অধিকার আছে কিনা? তা কিভাবে খাব? এভাবেই বিবেক প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রন করে। কিন্তু এ বিবেক শক্তিকে পাশবিক শক্তির তুলনায় শক্তিশালী হবার অনুশীলন হয় সিয়াম সাধনার মাধ্যমে। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রমজানের রোজা ফরজ করেছেন রুহানী রোগের চিকিৎসা করে, এক আল্লাহর সাথে মানুষের গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য। সর্বোপরি তাকওয়া মন্ডিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তোলার উদ্দেশ্যেই রোজা ফরজ করেছেন।

আমাদেরকে এখন অনুধাবন করতে হবে তাকওয়া কি? কিভাবে এগুন অর্জন করা যেতে পারে?

তাকওয়া আরবী শব্দ। মুল ধাতু বেকায়াতুন, তার অর্থ বাঁচা, মুক্তি, নিষ্কৃতি, সতর্কতা ভয়ভীতি। পরিভাষায় আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ নির্দেশিত ও রাসূল (সাঃ) পথে জীবন পরিচালিত করা, জীবনের কোন বিভাগে আল্লাহর হুকুম যেন লংঘিত না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে সতর্কতার সাথে চলার নামই তাকওয়া। এরূপ তাকওয়া মন্ডিত জীবন যাদের তারা আখিরাতের পীড়াদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। সুরা বাকারার ২নং আয়াতে মুত্তাকীদের পরিচয় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (১) তারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। (২) সালাত কায়েম করে। (৩) আল্লাহর দেয়া রিজিক থেকে খরচ করে। (৪) শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার পূর্ববর্তী নবী রাসূলদের উপর নাজিলকৃত হেদায়েতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। (৫) আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষন করে। সুরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে মুত্তাকীর গুনাবলী এভাবে উল্লেখ আছে।

১। আল্লাহ, আখেরাত ফেরেশতা, কিতাব নবী রাসূলদের প্রতি ঈমানের যথাযথ ঘোষণা দান।

২। আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে নিকটাত্মীয়, গরীব দুঃখীদের মাঝে অকাতরে অর্থদান।

৩। সালাত কায়েম ও যাকাত দেয়া।

৪। ওয়াদা পূর্ণ করা।

৫। ছবর করা সর্বাবস্থায়। যারা এই সব গুনাবলীর অধিকারী তারাই ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী এবং তাকওয়ার অধিকারী। তাই রোজাব্রত পালনের সাথে সাথে উপরোল্লিখিত গুনাবলী অর্জনে সদা তৎপর থাকতে হবে। তাহলেই সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্যে সফল হবে।

উল্লেখিত আলোচনার পর চিন্তা করতে হবে একমাসের নিরবচ্ছিন্ন এ ট্রেনিং এর শিক্ষা কি? আমাদের সমাজ জীবনে রোজার আবেদন কি? এ প্রশ্নের জবাব মূল্যায়ন করতে হবে রোজার সামগ্রিক বিধি বিধান থেকে। তা হলোঃ

(১) রোজা মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের গুন সৃষ্টি করে। যেমন- হাদীসে আল্লাহর রাসূল বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন রোজাদার কে ইফতার করায় তার একাজ তার গুনাহ মাফ ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার কারণ হবে। এ হাদীস মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অটুট করতে ইংগিত বহন করে।

(২) রোজা সমবেদনা ও সহানুভূতির গুন সৃষ্টি করে। বিত্তবান ধনীরা রোজা পালনের মাধ্যমে বুঝতে পারে দুঃখীদের পেটের জ্বালা। অসহায় নিঃস্ব মানুষের

www.nagorikpathagar.org

কল্যাণে এগিয়ে আসতে অনুপ্রেরণা যোগায়। আল্লাহর রাসূল বলেন 'সে ব্যক্তি পূর্নাঙ্গ মুমীন নয়, যে পেট পুরে খায় আর তার প্রতিবেশী অভুক্ত। রোজা অভুক্তদের প্রতি সমবেদনাশীল করে তোলে।

(৩) মানব জীবনে ব্যাবহারিক সংযমশীলতা ও ইচ্ছা শক্তি নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে রোজা ফলপ্রসু শিক্ষা দেয়।

(৪) ব্যক্তিগত আচার আচরণ সংশোধনের শিক্ষা দেয়। আল্লাহর রাসূল বলেন 'যে বক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করবেনা তার শুধু খানা-পিনা ত্যাগ আল্লাহর প্রয়োজন নেই।'

(৫) রোজা সামাজিক শান্তি নিশ্চিত করে। রাসূল (সাঃ) বলেন 'যে ব্যক্তি রোজা রাখবে তার দাংগা ফাসাদ হতে বিরত থাকা উচিত, কেহ গালি দিলে বা ঝগড়া বিবাদ করলে পরিষ্কার ভাবে বলা উচিত ভাই আমি রোজাদার।' রোজা এমনি ভাবে সামাজিক শান্তি নিশ্চিত করে।

(৬) কষ্ট সহিষ্ণুতা ও পরিশ্রম প্রিয়তার প্রশিক্ষন দেয় ঃ বৎসরের একটি মাস ৭২০ ঘন্টার ধারাবাহিক প্রোগ্রাম সূচী রোজাতে বিদ্যমান। সুবহে সাদিক হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোজা রেখে তারাবীহ পড়তে হয়। তারাবীহ শেষে কিছু ঘুম গিয়ে সেহ্‌রী খেতে উঠতে হয়। আবার ফজর আদায় করতে হয়। এভাবে কষ্ট সহিষ্ণু জাতিতে পরিনত করে আমাদেরকে।

(৭) রোজা মানুষকে উপহার দেয় ইন্দ্রিয় লোক অতিক্রম করার জন্য নির্মল আত্মা, চিন্তা ভাবনা করার জন্য পরিষ্কার মন, কর্মসম্পাদনের জন্য হালকা শরীর।

(৮) রোজা মানুষকে ধৈর্যশীলতা ও নিঃস্বার্থপরতার শিক্ষা দেয়।

(৯) রোজা মানুষকে নিয়মানুবর্তিতার উপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং সুস্থ্ভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়।

(১০) তাকওয়ার গুন সৃষ্টি করে ঃ মানুষ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরন করতে গিয়ে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করার শিক্ষা দেয় মাহে রমজানের রোজা।

আমাদের সমাজে যে হারে অন্যায়, অপরাধ, দুর্নীতি, অনিয়ম বৃদ্ধি পাচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণের উপায় মানুষের মনে আল্লাহ্ ভীতি জাগরুক করা। কোন মানুষের মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হলে ওজনে কম দেয় না, মিথ্যা বলে কাউকে ধোকা দেয় না, দায়িত্ব যথাযথ আনজাম দেয়, কর্তব্য কাজে অবহেলা করে না। নিজে অপচয় করে না, রাষ্ট্রীয় অর্থ বা কারো সম্পদ নষ্ট হতে দেয় না। নিয়ম মেনে চলে, অনিয়মের আশ্রয় নেয় না, নিজে দুর্নীতি করে না এক্ষেত্রে কাউকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা দান থেকে বিরত থাকে, হালাল পথে উপার্জনে কঠোর পরিশ্রম করে। রোজা আমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে শিক্ষা দেয়। আত্মশুদ্ধি অর্জন করার পথে আমাদেরকে রমজান মাসে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া উচিত।

গ্রন্থ সূত্র–

(১) আরকানে আরবা– সাইয়েদ আবুল হাসান আল নদবী।

(২) সেবা– খালেদ রকিব

(৩) নামাজ রোজার হাকীকত–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

(৪) তাকওয়া অর্জনের মাস মাহে রমজান– মতিউর রহমান নিজামী।

www.nagorikpathagar.org

ভোট ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ভোট বর্তমান যুগে নাগরিকদের মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার। জনগন তাদের পছন্দমত রাষ্ট্র ব্যাবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন, নেতৃত্ব সৃষ্টি, আইন তৈরী, সাংবিধানিক পরিবর্তন সাধনের জন্য স্বাধীন ভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্যে শুধুমাত্র কোন একটি দলের জয় পরাজয় নির্ভরশীল নয় বরং গোটা জাতির ভাগ্য পরিবর্তন, উন্নতি, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, সুখ, শান্তি নিশ্চিত করার প্রধানতম মাধ্যম ভোট।

আধুনিক বিশ্বে জনগনের মতামত যাচাই করে দেশের শাসক নির্বাচন করা হয়। এমন এক সময় ছিল যখন নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য যুদ্ধ করতে হত। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক মদীনায় রাষ্ট্র ব্যাবস্থা পরিচালনা, হযরত আবু বকর (রাঃ) সহ অন্যান্য খলীফা নির্বাচন ইসলামে জনগনের নেতা জনগন কর্তৃক নির্বাচিত করার এক নুতন ধারা সৃষ্টি করে। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, জনমতের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন ইসলামেরই অবদান।

ভোট অর্থ মতামত, যে পত্রে মতের প্রকাশ করা হয় তাই ব্যালট পেপার (A piece of paper use in voting)। প্রাপ্ত বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি সংবিধান স্বীকৃত অধিকার গোপন ভাবে পছন্দ মাফিক প্রয়োগের মাধ্যমে নেতৃত্ব বাছাই করে। তাই ভোটাধিকার একটি পবিত্র আমানত, আমানতের আভিধানিক অর্থ বিশ্বস্ততা। কেউ প্রকৃত অধিকারীকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হলে আমানতের খিয়ানতকারী হিসেবে পরিগণিত। যাকে ভোটার ভোট প্রদান করে হৃদয়ে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকে, তিনি নেতা হবার অধিকতর উপযুক্ত। দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির পথে জনগনকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম। ভোটের মাধ্যমে ভোটদাতা কোন দলের প্রতি আস্থা বা অনাস্থা জ্ঞাপন করে গোটা জাতির প্রতিনিধি নিযুক্তির ক্ষেত্রে ভোটই হচ্ছে বর্তমানে প্রধান হাতিয়ার। তাই এ হাতিয়ার প্রয়োগকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক।

ইসলাম নেতৃত্ব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কিছু গুনাবলী তুলে ধরেছে। মদ খোর অসৎ, ধোঁকাবাজ, প্রতারক, খোদাবিমুখ ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচনের সুযোগ নেই। নেতৃত্ব সামাজিক শান্তি নিশ্চিত করে আবার অধঃপতন ত্বরান্বিত করে। নেশাগ্রস্থ ব্যক্তি ড্রাইভার হলে যেমনি যাত্রীদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয় তেমনি অসৎ নেতৃত্ব অশান্তির অনল প্রবাহ সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। তাই 'যাকে খুশী তাকে ভোট দানের পরিবর্তে' খোদাভীরু আমানতদার, ন্যায় পরায়ন, সত্যবাদী, সৎ, যোগ্য, নিঃস্বার্থ ধার্মিক, বিচক্ষন পরোপকারী, সত্য ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক ব্যক্তিকে ভোট দিতে হবে। যার হাতে জাতীয় আদর্শ, জনগনের জানমাল, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গনতন্ত্র, নিরাপদ থাকবে। যিনি কুরআনে বর্ণিত চারটি মৌলিক কাজ আনজামে অগ্রনী ভূমিকা পালন করবেন। নামাজ কায়েম, যাকাত আদায়, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতিরোধে আপোষহীন ভূমিকা পালন করবেন। তবে কোন অবস্থাতেই ফাসেক, জালেম, কাফের, মুশরিক, মুনাফিক, বিদয়াতী, চরিত্রহীন, দূর্নীতিবাজ, ধোকাবাজ, সুবিধাবাদী, ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তির প্রতি ভোটাধিকার

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োগের অবকাশ নেই।

যাকে ভোট দেয়া হল তিনি ভোট পেয়ে আল্লাহর আইন চালু, সুদ-ঘুষ, মদ, জুয়া, হাউজি, লটারী, পতিতাবৃত্তি, চোরাচালনী বন্ধ করলে এককথায় যাবতীয় 'মারুফ' কাজের প্রচলন ও মুনকারের উচ্ছেদ করলে ভোটদাতা সাওয়াব পাবেন। আর ভোট পেয়ে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, অনৈতিক কার্যক্রমের প্রসারে ভূমিকা রাখলে পাপের একটি অংশ ভোটদাতা পাবেন। তাই ভোট দেয়ার সময় সর্বশক্তিমান আল্লাহকে সাক্ষী রেখে খোদাভীরু, যোগ্য ব্যক্তিকে রায় দেয়া কর্তব্য। সামান্য স্বার্থে, অর্থের লোভে, আত্মীয়তার বন্ধনের খাতিরে ভোট অপাত্রে দান গর্হিত। সকল দলের নির্বাচনী ইশ্‌তেহার, দলীয় কর্মসূচী, নেতৃত্বের চরিত্র, দেশ প্রেম দেখে ভোট প্রয়োগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যাদের দলীয় কর্মসূচীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা নেই, যারা ক্ষমতা থাকাকালীন ইসলাম উৎখাত করতে চেষ্টা করেছেন। ইসলাম বিরুধিদের লালন করেছেন, ইসলাম প্রিয় মানুষের উপর নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়েছেন, তারা নির্বাচন পূর্বে ইসলামের যতই দোহাই জনগনের সামনে প্রদান করুকনা কেন তারা ইসলামের পক্ষ শক্তি হতে পারে না তারা ধর্ম ভিত্তিক নয় বরং ধর্ম ব্যাবসায়ী। তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ ভীরু ব্যক্তি বাছাই করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ফাসেক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা অন্যায়। আমাদের সমাজে কিছু ব্যক্তির মধ্যে এমন ধারণা বিদ্যমান ভোট পাশ্চাত্যের গনতন্ত্রের উপহার, তাই দ্বীনদার, ঈমানদার, পরহেজগার দাবীদার সে সকল ব্যক্তিরা নির্বাচনে অংশ গ্রহন কিংবা ভোট দান থেকে বিরত থাকে। যার ফলে এমন ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয় যারা দ্বীনহীন, খোদা বিমুখ, ইসলাম বিদ্বেষী। যারা নির্বাচিত হয়ে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষনের পরিবর্তে মুসলীম তাহযীব তামাদ্দুন ধ্বংস করে অথচ এ সকল ব্যক্তিরা যদি সৎ, যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতেন তাহলে দেশের সামগ্রিক চেহারা পাল্টে যেত। মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) ভোট না দিয়ে বিরত থাকাকে হারাম, নাজায়েজ, পুরো জাতির উপর জুলম করার সমতুল্য আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমান প্রচলিত গনতন্ত্র ইসলাম সম্মত নয়। এ অজুহাতে নির্বাচন থেকে দূরে থাকার অবকাশ নেই।

বর্তমান গনতান্ত্রিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য 'ব্যালট যুদ্ধকেও' কাজে লাগাতে হবে। তাই ভোট জিহাদে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ভূমিকা রাখা ঈমানী দায়িত্ব। জিহাদে যেমনিভাবে নারীদের খিদমাত বৈধ তেমনি ভাবে দেশে আল কুরআনের আইন জারী করার ক্ষেত্রে সৎ নেতৃত্ব নির্বাচনে মহিলাদের অংশ গ্রহন করতে হবে। অমুসলিম ভোটারদের জন্য এমন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা উচিৎ যাঁরা ধার্মিক, পরোপকারী, দেশ প্রেমিক। ধার্মিক ব্যক্তির হাতে সকল ধর্মের নাগরিকদের জান ও মাল নিরাপদ। কিন্তু চারিত্রহীন, দুর্নীতি পরায়ন ব্যক্তিদের হাতে দেশের কোন কিছুই নিরাপদ নয়।

দেশের কল্যাণ সাধন, জনগনের সার্বিক মুক্তি অর্জনে ব্যালট যুদ্ধে সত্য ন্যায় পন্থীদের বিজয়ী করা প্রয়োজন। যারা ক্ষমতায় গিয়ে নিজেদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করতে সব সময় তৎপর আর ক্ষমতা হারালে জনগনের ভাগ্যের জন্য মায়া কান্না করে। তারা জনতার মংগলের জন্য কাজ করে না, নিজের মংগলের জন্যই জনতার মংগলের কথা বলে।

www.nagorikpathagar.org

ইখতিলাফ

ইসলামের শত্রুরা প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক স্থানে মুসলমানদের দুর্বল করার জন্য বিভিন্ন কৌশলে কাজ করে যাচ্ছে। তারা মুসলিম শক্তিকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে পুরাপুরি সফল হয়নি। তাদের এ ষড়যন্ত্রে মুসলিম শক্তি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃদ্ধিও পেয়েছে। তাতার যুদ্ধ ও মুঘল যুদ্ধ তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ, কিন্তু মুসলমানদের শক্তি দুর্বল করার জন্য সবচেয়ে সফল হাতিয়ার মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, সংঘাত সংঘর্ষ যা মুসলমানদের শতদা বিভক্ত করে, শক্তি দুর করে ও শক্তি হ্রাস করে এবং মুসলমানদের বিভিন্ন দল, উপদলে বিভক্ত করে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত করে। এসব দৃশ্য ইসলাম বিরোধিরা প্রত্যক্ষ করে হাসি-তামাশা করে, বর্তমান সময়ে মুসলমানদের অনৈক্য, পারস্পরিক দ্বন্ধ-সংঘাত, মতবিরোধই হচ্ছে বিপদ-মুসিবত, লাঞ্চনা ও অপমানের মূল কারণ। এ কারণেই ইখতিলাফ কি? মুসলিম জাতির মধ্যে এর প্রভাব, ইখতিলাফের প্রকারভেদ ও তার অশুভ প্রতিফল থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ইখতিলাফ কি?

আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী তার মুফরাদাত গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'ইখতিলাফ হচ্ছে প্রত্যেকের কথা ও কর্মে অন্যের থেকে বিভিন্ন পথ ও পন্থা অবলম্বন করা। এ ইখতিলাফ কোনো সময় কর্মপদ্ধতিগত হয়, কোনো সময় জ্ঞানগত বা তাত্ত্বিক হয়। কর্মপদ্ধতিগত হচ্ছে দাওয়াতের পদ্ধতিগত ও কর্মের স্তর বিন্যাস ও দাওয়াতের উপায়-উপাদানের-ক্ষেত্রে। জ্ঞানগত বা ইলমী মতপার্থক্য দেখা যায় মাসায়েলের ক্ষেত্রে, চাই ফিকহী হোক কিংবা আকিদাগত বা অন্য বিষয়ে।

মুসলিম জাতির মধ্যে ইখতিলাফ

অনেকের ধারণা মসলীম উম্মাহ ইখতিলাফ মুক্ত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানের মধ্যে সমতা না থাকায় বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। একজন এক বিষয়ে গুরুত্ব দেয় অপরজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে আরেক বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন কাজের পদ্ধতিগত বিষয়েও চিন্তার পার্থক্য হয়, তাই ইখতিলাফ মানব জীবনে স্বাভাবিক। এই প্রবন্ধে আলোচনার বিষয় এটা নয় কিভাবে সম্পূর্ণভাবে ইখতিলাফ মুক্ত থাকা যায়, কেননা এটা অসম্ভব। আলোচনা করবো ইখতিলাফের ধরণ, প্রকার, প্রকৃতি নিয়ে। ইখতিলাফের ক্ষতিকর খারাপ ফলাফল সম্পর্কে। এটা বাস্তব স্বীকৃত যে, যখন কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হয় তাতে যদি প্রবৃত্তি ও সংকীর্ণতা মুক্ত থাকা যায়, তাহলে কুফল থেকে মুক্ত থাকা সহজ হয়। কিন্তু আমরা বর্তমানে তা কি করছি?

ইখতিলাফের প্রকারভেদ

প্রথমতঃ অনেক সময় ইখতিলাফ হয় অকাট্যভাবে প্রমাণিত দ্বীনের মূল বিষয়ে। চাই তা মৌলিক আকীদাগত বিষয়ে হোক। মৌলিক বিষয়ে ইখতিলাফের

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইলমী বিষয়ে যেমন– সুদ বৈধকরণ, গাইরুল্লাহর নামে জবেহকরণ, যতোক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের মনোভাব ত্যাগ না করবে, আমরা কোনো বিষয়ে তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া বা সহাযোগিতা করার কল্পনা করা যায় না। এ ধরনের ইখতিলাফকে ইখতিরাক নামে অভিহিত করা যায়। এ ক্ষেত্রে তাদের চিন্তার সাথে মতপার্থক্য করে বসে থাকা যথেষ্ট নয় বরং তাদের এ গর্হিত বিশ্বাস থেকে পৃথক থাকার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিতে হবে এবং উম্মতের নিকট তাদের ত্রুটিসমূহ সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরতে হবে। যে কাজ বা বিশ্বাস মানুষকে ইসলামের মৌলিক নীতি, দ্বীনের অকাট্য বিষয়, থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তা কুফরীর দিকে ধাবিত করে। এমতাবস্থায় আমাদের কর্তব্য তাকে সতর্ক করা।

যদি কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টিতে এ ত্রুটি দেখা যায় তাহলে আমাদেরকে এ ধরনের কর্মের বিরোধিতা করতে হবে। আমরা এ ফয়সালা দেয়া সঠিক নয় যে, তারা কুফর, বিদআত বা ভ্রান্ত আকীদায় লিপ্ত বরং তারা এ ধরনের কর্ম থেকে যতোক্ষণ পর্যন্ত ফিরে আসবে না ততোক্ষণ আমরা পৃথক থাকবো। সাথে সাথে কৌশলে ও উত্তম চারিত্রিক মাধুর্যতা দিয়ে নসীহত করবো তাদেরকে। তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার জন্য সহযোগিতা করব। আমাদের জন্য এটা সমীচীন নয় যে, তাদের ভ্রান্ত আকীদায় শয়তানের সহযোগিতা করবো গালমন্দের মাধ্যমে। এটা আল্লাহর পথে আহবানের কৌশল নয়।

অতঃপর যখন হিকমত ও উত্তম নসীহতের পরেও ভ্রান্ত আকীদা থেকে ফিরে আসবে না বলে সুস্পষ্ট হবে, তখনও নসীহত করতে হবে ঝগড়া-বিবাদমুক্ত থেকে। যখন সে তওবা করবে না বা ফিরে আসবে না তখন জনগণের মধ্যে প্রচার করতে হবে এ ধরনের চিন্তা ও কর্ম সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। কিন্তু এটা বলা যাবে না এ কর্মে লিপ্ত অমুক ব্যক্তি কাফের। হাদীস থেকে এ সম্পর্কে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা পাইঃ

১. আমাদের উচিত কোন অপরাধ বা ত্রুটি কুফরীর অন্তর্ভূক্ত কোনটা অন্তর্ভূক্ত নয়, কোন বিদআত ব্যক্তিকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে কোনটি বিচ্ছিন্নকারী নহে তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা। কেননা অনেক ভ্রান্তি যখন ব্যক্তি বা সংস্থা থেকে সংঘটিত হয় তার উপর ভিত্তি করে অনেকেই কাফের ফতোয়া দিয়ে ফেলেন অথচ সে ভ্রান্তি কুফরীর পর্যায়ভূক্ত নয়।

২. কারও প্রতি কুফর, বিদআত, ফিসক-এর সম্বন্ধযুক্ত করার পূর্বে যথাযথ যাচাই-বাছাই প্রয়োজন। দলীল ও প্রমাণ ছাড়া এ ধরনের হুকুম প্রদান যথার্থ হতে পারে না। এ প্রকৃতির বিষয়ে ব্যাপক যাচাই-বাছাই, অনুসন্ধান, পূর্ণাঙ্গ অবস্থা অবহিত হওয়া আবশ্যক। হ্যাঁ, যখন দ্বীনের মৌলিক দিকগুলো অস্বীকার করা হবে যেমন কালেমায়ে শাহাদাত, নামায, রোযা প্রভৃতি অস্বীকার করলে কাফেরের পর্যায়ভুক্ত হবে।

www.nagorikpathagar.org

[redacted]নের মৌ[redacted]ক এমন সূক্ষ্ম দিক রয়েছে যা বিশ্বাসের সাথে জড়িত। যেমন– আল্লাহর ছিফা[redacted]ত, শাফায়াত প্রভৃতি বিষয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে সম্যক ধারণার অভাবে কদাচিত এমন উক্তি বা ধারণা আসে যার সম্পর্কে তার অনুভূতি বা চিন্তায় গভীরতা নেই। এ পর্যায়ে ভ্রান্ত চিন্তার জন্য 'কুফুরীর' বিধান প্রযোজ্য নয়। দ্বীনের এ ধরনের বিষয়ে সাধারণ জনগণকে পরীক্ষায় ফেলে ফেতনায় লিপ্ত করা উচিত নয়।

৪. দ্বীনের পথে আহবানকারী সম্প্রদায় অন্যের ত্রুটি সন্ধানে সদা লিপ্ত থাকা, অপরকে ফাসেক, জাহেল ফতোয়া দান অনুচিত।

৫. অনেক সময় আকীদাগত এমন বিষয়ে ইখতিলাফ হয় যার উপর সকলের ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত নয়। এটা ইফতিরাকের পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং এ ধরনের ইখতিলাফ হওয়া বিচিত্র নয়। যেমন নবী (সাঃ) আল্লাহ তায়ালাকে সরাসরি দেখেছেন না আত্মিকভাবে, কারও মতে মৃত মানুষ জীবিতদের আহবান শ্রবণ করেন কেউ এটা অস্বীকার করেন। এমনিভাবে কুরআনের ক্বিরাতের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়, এ ধরনের মতপার্থক্য কুফরী বা ভ্রান্তি নয়।

সার কথা হচ্ছে, দ্বীনের সর্বসম্মত মৌলিক দিক থেকে বিচ্যুতিই ইখতিরাক বা বিচ্ছিন্নতা।

দ্বিতীয়তঃ এ ধরনের ইখতিলাফ ইজতিহাদী ফিকহী মাছায়েলের ক্ষেত্রে অধিক দেখা যায়। তার কারণ সুস্পষ্ট। এ ক্ষেত্রে যিনি সঠিক পথে থাকবেন তিনি ডবল প্রতিদান পাবেন। আর যার মত সঠিক হবেনা তিনিও প্রতিদান পাবেন একটি। কারও পাপ হবে না। যদি সংকীর্ণতা, গোঁড়ামী ও প্রবৃত্তির বাসনামুক্ত হয়ে ইজতিহাদ করেন। রাসূল (সাঃ) বলেন, 'যিনি ইজতিহাদ করলেন ও সঠিক পথে থাকলেন তিনি দু'টি আর যিনি ইজতিহাদ করলেন ও ভুল করলেন একটি প্রতিদান পাবেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এ ধরনের মতপার্থক্যের অনেক কারণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে মানুষের বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পার্থক্য অন্যতম। সত্য কথা হচ্ছে, ফিকহী মাসায়েলে মতপার্থক্য হওয়া দোষের কিছু নয়, বরং দোষনীয় হচ্ছে গোষ্ঠীগত বা সংকীর্ণ গোড়ামীর কারণে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত। কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, অনেক গোড়া হানাফী, শাফেয়ী বিভিন্ন মাযহাবের লোকজন এক মাযহাবের সাথে অন্য মাযহাবের ছেলেমেয়ের বিবাহ ও শাদী থেকেও বিরত থাকেন।

সর্বসাধারণের মাযহাবী গোড়ামীর প্রতি লক্ষ্য করা হলে দেখা যায়, একই মসজিদে আলাদা আলাদা ইমামের অধীনে চার মাযহাবের চার জামাত অনুষ্ঠিত হতে। আল্লাহর প্রশংসা এ ধরনের ইখতিলাফ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা এ ধরনের ইখতিলাফের ক্ষেত্রে ? করণীয় হচ্ছে–

(১) ইজতিহাদী মাসায়েলে মতপার্থক্য সকল যুগেই ছিলো। সলফে সালেহীন চার ইমামসহ প্রত্যেক স্তরে এ ধরনের এখতিলাফ দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকে তার দৃষ্টিতে অধিক নির্ভরশীল মতটি গ্রহণ করতে হবে। সুফিয়ান সওরী (রহঃ)-এর একটি উক্তি এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'যখন তুমি দেখবে

www.nagorikpathagar.org

কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়ে তোমার মতের বিপরীত আমল ক[illegible] নিষেধ করবে না।" ইমাম আবু হা[illegible]ন, 'আমি যে ম[illegible] আছি তা অসন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করা কর্তব্য নয়, বরং যার নিকট এর চেয়ে উত্তম ম[illegible] বা পন্থা বিদ্যমান সে যেনো তার আলোকে কাজ করে।' ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাদি (রহঃ) বলেন, 'জ্ঞানীগণ সবসময় মতপার্থক্য করেছেন বিভিন্ন বিষয়ে। কেউ কোনো বিষয় হারাম বলেছেন, কারও মতে তা হালাল। তবে এ ক্ষেত্রে একে অপরের ত্রুটি ঘাটাঘাটি করতেন না।

(২) যখন দু'জন ইখতিলাফে লিপ্ত হবে সঠিক পথে একজনেই থাকবেন। তিনি গবেষণায় সফল হিসেবে দুটি প্রতিদান পাবেন, অপরজন যিনি ভুল করবেন তিনি এ জন্য পাপী হবেন না, বরং একটি সওয়াব পাবেন। নিঃসন্দেহে সঠিক মতের জন্য দু'টি প্রতিদান পাওয়া একটি প্রতিদানের অধিকারী হওয়ার চেয়ে উত্তম, তাই মুসলমানদের উচিত এ ধরনের সঠিক ইজতিহাদ করার প্রচেষ্টা চালানো। এ জন্য দলিল-প্রমাণের প্রতি দৃষ্টিপাত, প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে দূরে থেকে মাযহাবী গোড়ামী মুক্ত থাকা প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ এ প্রকারের মতপার্থক্য দাওয়াতের ক্ষেত্রে। দাওয়াতের পন্থা, কৌশল, উপকরণ ব্যবহার ও গুরুত্বের আলোকে স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে হয়। এটা বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন, সংস্থা বা শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়। যেমন– কোনো দলের দৃষ্টিতে সভা-সমাবেশ, সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ। আবার কেউ এটাকে সময়োপযোগী মনে করেন না। বিশেষ কিন্ডার গার্টেন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কিশোর মনে ইসলামী ভাবধারা সৃষ্টিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। কারও মতে সাধারণ জনগণের আকীদার পরিশুদ্ধিকরণ ও প্রশিক্ষণ দান গুরুত্বপূর্ণ, কেহ ওয়াজ নসিহত, ইবাদাতের তালিম ও চারিত্রিক মাধুর্যতা সম্পর্কে হেদায়েত দানকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। কেহ ইসলামের রাজনৈতিক দিককে প্রাধান্য দেন, কেহ নারীদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এভাবে বিভিন্ন বিষয়ে প্রাধান্য দান ও পদ্ধতি অবলম্বনে মতপার্থক্য দেখা যায়। এখন চিন্তার বিষয়, এতদসত্ত্বেও ঐক্য কি সম্ভব? গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ ধরনের মতপার্থক্যে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি সম্ভব। যার প্রতি সাধারণভাবে মুসলমানগণ আগ্রহী। প্রত্যেক দল নিজস্ব কৌশল অবলম্বনে কাজ করবে, একে অপরের বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকবে। ইসলাম বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় এক কাতারে এসে উপস্থিত হবে। এ ধরনের মতপার্থক্য সকল ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি? বাস্তবতা হচ্ছে পীড়াদায়ক। মুসলমানগণ শতধা বিভক্ত। ঐক্যের বন্ধনে থাকা সহজ, অথচ গোঁড়ামী ও অন্ধ অনুসরনের জন্য তা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা আমাদের অবস্থা ও আমাদের শত্রুদের অবস্থা মূল্যায়ন করলে দেখতে পাই, প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সবখানেই তারা শতধা বিভক্ত। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা ষড়যন্ত্র করার ক্ষেত্রে তারা সব এক। প্রকৃতপক্ষে তারা শক্তি ও সংখ্যার দিক

www.nagorikpathagar.org

থেকে বেশী। মুসলমানগণ আনুপাতিক হারে কম, মুসলিম দায়ীর সংখ্যা অল্প, শক্তি, সামর্থও সীমিত। এতদসত্ত্বেও বিভিন্নভাবে দল-উপদলে বিভক্ত। একে অপরের নিন্দাবাদ, দোষচর্চা, যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত। অথচ ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা মুসলমানদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। মুসলমানদের পারস্পরিক অনৈক্য, হানাহানি, তাদের শত্রুদের হাসি-তামাশা ও আনন্দ-ফূর্তির কারণ। এটা নিশ্চিত যে, মুসলমানদের পারস্পরিক এ ধরনের দ্বন্দ্ব ব্যক্তিতে বা সমষ্টিতে যেখানে বিদ্যমান তা নিম্নবর্ণিত উপায়ে দূর করা সম্ভব।

(১) কিতাব ও সুন্নাহকে ফায়সালাকারীরূপে গ্রহণঃ কোনো কাজ করার পূর্বে কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টিপাথরে যাচাই করা প্রয়োজন, যদি সঠিক হয় তাহলে সে মতে ফায়সালা করতে হবে অন্যথা বিরত থাকতে হবে। কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে কুরআন ও প্রমাণিত সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(২) প্রবৃত্তি ও অন্ধ বিরোধিতা থেকে বিরত থাকা ও আত্মপ্রীতিমুক্ত থাকা ইমাম মালেক (রহঃ) যখন মুয়াত্তা লিখা সম্পন্ন করলেন, তখন খলিফা আবুজাফর আল মনসুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তদানুযায়ী আমল করার জন্য সকলকে বাধ্য করতে, কিন্তু ইমাম মালেক তাতে আপত্তি জানান এবং বলেন, 'হে আমিরুল মুমিনীন! আসহাবে রাসূলগণ বিভিন্ন শহরে বিভক্ত। প্রত্যেকের নিকট জ্ঞান রয়েছে, সকলকে অবকাশ দিন প্রত্যেকে ইচ্ছে মতো নিজেদের জন্য যা উত্তম মনে করবে তা গ্রহণ করুক।' অন্য গ্রন্থে তার উক্তি লিপিবদ্ধ আছে এভাবে, 'হে আমিরুল মুমিনীন! আলেমদের ইখতিলাফ রহমত এ জাতির জন্য, প্রত্যেকে তার অনুসরণ করবে যা তার নিকট সহীহ মনে হবে।'

(৩) বিরোধিতা গ্রহণ করার প্রশস্ত চিত্ত ও অপরের ইজতিহাদ অস্বীকার না করা। এ ক্ষেত্রে সুফিয়ান সওরী ও ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। উক্তিটি হচ্ছে, এ কথাটি এ বিষয়ে আমার মত, এটা আমার দৃষ্টিতে সর্বোত্তম, যে ব্যক্তি আমার চেয়ে উত্তম কথা পেশ করবে উহাই আমার মতের চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।' ইমাম আহমদ বিন হাম্বলেরও অনুরূপ উক্তি বিদ্যমান।

(৪) নেতৃবৃন্দ, আলেমগণ, দায়ীগণ ও বিভিন্ন দল পারস্পরিক সুধারণা পোষণ। অনেক যুবক ইখতিলাফকে দ্বীন থেকে বিচ্যুতির পর্যায়ে পরিগণিত করেন। অথবা এটাকে ভ্রান্তি, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও অজ্ঞতা হিসেবে অভিহিত করেন দ্বীনের মৌলিক নীতিমালার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ছাড়াই।

কেননা কুফরীর হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রে কতিপয় নীতিমালা বিদ্যমান। এমনকি বিদআতী, প্রবৃত্তি পূজারী, ফাসেক, জাহেল প্রভৃতি বলার ক্ষেত্রে। কেননা যিনি যাকে এসব ফতোয়া দিচ্ছেন তার মধ্যে এ ধরনের ত্রুটি না থাকলে ফতোয়াদানকারীর প্রতিই তা প্রত্যাবর্তন করে। অতএব কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনে কোনরূপ ত্রুটি দেখলেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন, দ্বীন থেকে বিচ্যুতির ফতোয়া দান বাঞ্ছনীয় নয়। এ ক্ষেত্রে অনুসন্ধান, যথাযথ যাচাই-বাছাই প্রয়োজন। কেননা অনেকেই অজ্ঞতাবশত, সঠিক ধারণার অভাবে

www.nagorikpathagar.org

দ্বীনের বিভিন্ন আহকাম সম্পর্কে ভুল করেন। অনেকেই বাধ্য হয়ে কুফরী উক্তি, গর্হিত কাজ করতে হয়। যদি তা না করে তাহলে হত্যা, নির্যাতন, সম্মান সম্ভ্রম বিনষ্টের মুখোমুখি হতে হয়।

আমাদেরকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তা হচ্ছে আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারী অনেকেই উলামায়ে মুতাকাদ্দেমীন ও মুতায়াখখীরীনদের সমালোচনায় মত্ত। এটা অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। আমাদের উচিত বিজ্ঞজনদের কথা শ্রবণ, তবে আমরা কোনো ত্রুটিপূর্ণ উক্তি গ্রহণ করবো না। এতদসত্ত্বেও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আবশ্যক। আবদুল্লাহ বিন মুবারক ও ইমাম আওযায়ীর একটি ঘটনা এ ক্ষেত্রে অনুকরণীয়। আবদুল্লাহ বিন মোবারক বলেন, আমি একদা শামে ইমাম আওযায়ীর নিকট উপস্থিত হলাম। বৈরুতে তার সাথে দেখা হয়, তখন তিনি আমাকে বললেনঃ হে খোরাসানের অধিবাসী! কুফায় বিদআত সৃষ্টিকারী ব্যক্তিটি কে? এ দ্বারা তিনি আবু হানিফার কথা বুঝিয়েছেন। অতঃপর আমি নিজ বাড়ীতে ফিরে আসলাম এবং ইমাম আবু হানিফার বই পড়াশোনা করে উত্তম অনেক মাসায়েল সম্বলিত 'নুমান বিন সাবেতের' পান্ডুলিপি নিয়ে উপস্থিত হই। তিনি প্রশ্ন করলেন তোমার হাতে এটা কি জিনিস? তখন তাকে আমি তা প্রদান করলাম। তিনি তা দেখে বিস্ময়াভিভূত হলেন। সম্পূর্ণটা পড়লেন। তারপর বললেন, হে খোরাসানী কোন নোমান বিন সাবিত? জবাবে বললাম, তার সাথে ইরাকে সাক্ষাত হয়, তখন তিনি বললেন ইনি খুবই শীর্যস্থানীয় আলেম, তার কাছে গিয়ে জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করো। তখন আমি বললাম ইনিই আবু হানিফা যার সংস্পর্শে যেতে আপনি ইতিপূর্বে নিষেধ করেছেন। তখন ইমাম আওযায়ী তার ভুলের স্বীকৃত দিলেন এবং ইমাম আবু হানিফার জ্ঞান ও পান্ডিত্যের স্বীকৃতি প্রদান করলেন (এ থেকে বুঝা যায় কোনো আলেমের প্রতি অন্ধ বিরোধিতা, ফতোয়াবাজী ঠিক নহে, বাস্তব অবস্থার স্বীকৃতি দান সত্যপন্থী ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য)।

(৫) ঈর্ষা, হিংসা ও কুধারণা থেকে দূরে থাকা এ শিক্ষাই আল কুরআনে বিবৃত হয়েছে। মুসলমানগণ তার বিরোধিতাকারী ব্যক্তিকেও হৃদয়ে স্থান দেয়। তার সাথেও বিনম্র আচরণ করে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও আলী বিন মাদানী একদা বিতর্কে লিপ্ত হন, তারা এতো উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা আরম্ভ করলেন উপস্থিত লোকজন মনে করলেন অপ্রীতিকর কিছু ঘটে যায় কিনা। কিন্তু একটু পরেই দেখা গেলো যখন আলী বিন মাদানী চলে যেতে ইচ্ছে করলেন ইমাম আহমদ তার জুতা এগিয়ে দিলেন। এ কারণেই ইউনুছ বিন আলা (শাফেয়ীর ছাত্র) বলেন, আমি শাফেয়ী থেকে অধিক বিজ্ঞ দেখিনি। একদা এক মাসয়ালা সম্পর্কে তার সাথে বিতর্ক হয়, অতঃপর বিছিন্ন হলাম। কিছুদিন পর তার সাথে সাক্ষাত হয়, তখন তিনি আমাকে ধরে বললেন, হে আবু মূসা! এটা কি উপযোগী নয় যে আমরা ভাই ভাই থাকবো। যদিও কোনো মাসয়ালায় আমরা মতৈক্যে পৌছতে সক্ষম না হই।

(৬) মুসলিম ঐক্যের প্রবল বাসনা ও বিভেদ থেকে দূরে থাকা। ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে ঐক্য। এটা যথার্থ নয় যে, আনুষাঙ্গিক মাসয়ালা সংক্রান্ত মতভেদ পারস্পপরিক

www.nagorikpathagar.org

বিবাদ ও ঝগড়ায় লিপ্ত করবে। এ প্রসঙ্গে এ ঘটনাটি তাৎপর্যমন্ডিত। 'খলিফা রশীদ শিংগা লাগালেন, অতঃপর ইমাম মালেক (রঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তার জন্য পুনঃঅজুর প্রয়োজন নেই। অতঃপর রশীদ নামাযের ইমামতি করলেন, ইমাম আবু ইউসুফ তার পেছনে নামায পড়লেন। উল্লেখ্য, ইমাম আবু হানিফাও আহমদের মতানুসারে শিংগাদান অজু ভঙ্গের কারণ। কিন্তু ইমাম মালেক ও শাফেয়ী তা মনে করেন না। তাই ইমাম আবু ইউসুফকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলো, আপনি কি তার পেছনে নামায পড়েছেন? তখন তিনি উত্তরে বললেন, তিনি কি আমিরুল মুমিনীন নয়? এ ধরনের মতপার্থক্য রেখে ইমামদের পেছনে নামায পড়া থেকে বিরত থাকা রাফেজী ও মুতাজেলাদের বৈশিষ্ট্য।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) একদা হানাফীদের এক জামাতে ফজরের নামায আদায় করলেন কুনুত ছাড়া। অথচ কুনুত পাঠ তার মতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এ থেকে বুঝা যায়, দায়ী যখন দেখবে মুসলমানগণ ইজতেহাদী কোনো বিষয়ে একমত অনুসরণ করছে, সে মত তার পছন্দনীয় নয় এমতাবস্থায় তার জন্য এটা সমীচীন নয় যে, সে নিজ মতে গোঁড়ামী প্রদর্শন করবে।

(৭) নেতা, মতাদর্শ, পথ-পন্থা, সংগঠনের অন্ধ অনুসরণ থেকে বিরত থাকা। মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে সত্যের অনুসরণ করা, সত্য গ্রহণ করা, যার পক্ষ থেকেই তা বলা হোক না কেনো। সর্বোত্তম কথা শ্রবণের পর তার অনুকরণ মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য। ইমাম মালেক বলতেন, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিঘোষিত নীতি অনুযায়ী আমাদের কথা গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে। সত্য যদি শত্রুর পক্ষ থেকেও বলা হয়, তা গ্রহণ অপরিহার্য। আর মিথ্যা স্বপক্ষীয়দের নিকট থেকেও বলা হলে তা ত্যাগ করা জরুরী। আমাদের জন্য এটা সমীচীন নয় যে, আমরা কোনো ব্যক্তির অনুসরণ করবো সত্য ও অসত্য যাচাই না করে। আমরা আলেমগণের অনুসরণ করবো যখন দেখবো তারা মজবুত ও গ্রহণযোগ্য দলিলের ভিত্তিতে মত দিয়েছেন। সকল বিষয়ে তাদের অনুসরণ করা কর্তব্য নহে। কারণ গবেষক চিন্তাবিদগণ গবেষণা কর্মে সঠিক ও বেঠিক উভয় হতে পারেন। যখন এটা সুস্পষ্ট হবে যে, কোনো আলেম তার কোনো মতের ক্ষেত্রে সঠিক নন, তখন তার অনুসরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন– মুয়াজ বিন জাবাল অনুসন্ধান ছাড়া অন্ধ অনুকরনের নিষেধ করেছেন। অনুসরণের জন্য সঠিক পন্থা হচ্ছে যে কোনো জ্ঞানময় কথা শুনেই গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা অনেক সময় শয়তান ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করার জন্য যুক্তিপূর্ণ ভাষায় কথা বলে।

ইবনে আব্বাস বলেন, ধ্বংস সেসব অনুসন্ধানকারীদের জন্য যারা ভুল আলেমদের অনুসরণ করে। বলা হলো কিভাবে? তিনি বললেন, কোনো আলেম একটি মত পেশ করার পরে তদপেক্ষা অধিক যুক্তিসঙ্গত অপরের মত জানলো এবং পূর্বমত ত্যাগ করলো এতদসত্ত্বেও অনুসরণকারীগণ প্রথম ভুল পথটিতেই অবিচল থেকে অনুসরণ করেন। বর্তমান যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্যা হয় যাচাই-বাছাই, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া ব্যক্তির বা সমষ্টির অন্ধ অনুকরণের কারণে। অথচ রাসূল (সাঃ) এ থেকে বিরত থাকার জন্য বলেছেন। নিশ্চয়ই আমি আমার পরে উম্মতের তিনটি বিষয়ে ভয় করছি। জিজ্ঞাসা করা হলো সেগুলো কি? উত্তরে বললেন, আলেমদের পদস্খলন, অত্যাচারী শাসক,

www.nagorikpathagar.org

প্রবৃত্তির অনুসরণ। হযরত ওমর থেকে বর্ণিত তিনটি বিষয় দ্বীনকে ধ্বংস করে।

আলেমদের পদস্খল, কুরআন সম্পর্কে মুনাফিকদের বিতর্ক, ভ্রান্ত নেতৃত্ব। ইবনে মাসউদ বলেন, সাবধান তোমাদের কেহ দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির এভাবে অনুসরণ করোনা যেভাবে সে ঈমান আনলে ঈমান আনবে, কুফরী করলে কুফরী করবে। কেননা খারাপ ক্ষেত্রে কোনো আদর্শ অনুকরণীয় নেই। যখন আমরা কোনো আলেমের কথা গ্রহণের জন্য আহবান করবো তখন তা কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হবে। এটা এ জন্য নয় যে, বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মত দুর্বল করার জন্য বরং, তাদের মত অধিক নির্ভরশীলতার সাথে গ্রহণ করে তাদের পথে অবিচল থাকার জন্য। এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, আল্লাহ জ্ঞানকে পর্যায়ক্রমে উঠিয়ে নেন জ্ঞানীদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে।

উপসংহারে বলা যায়, ইখতিলাফ তিন প্রকার।

১. দ্বীনের মৌলিক নীতিমালা বা সর্বসম্মত বিষয়ে মতবিরোধ সংঘটিত হওয়া যা ব্যক্তিকে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

২. ফিকহী আনুষঙ্গিক বিষয়ে ইখতিলাফ। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না।

৩. দাওয়াতের পন্থা, প্রকৃতি ও উপায়-উপাদানের ব্যবহার, দাওয়াত দানের বিষয়ের গুরুত্বের আলোকে ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হওয়া। এটার কারণে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া ঠিক নহে, বরং ঐক্য স্থাপনের তীব্র আকাঙ্খা পোষণ প্রয়োজন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর থেকে বর্ণিত একদা রাসূল (সাঃ) শুনতে পেলেন দুই ব্যক্তি একটি আয়াত নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত। রাসূল (সাঃ) সে পথে যাওয়ার সময় তার চেহারায় মলিনতা ফুটে উঠলো এবং তিনি বললেন, ইতিপূর্বে যেসব জাতি ধ্বংস হয়েছে তারা কিতাব সম্পর্কে পরস্পর মতবিরোধ করেই ধ্বংস হয়। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তিকে আমি একটি আয়াত পাঠ করতে শুনেছি রাসূল (সঃ) থেকে যেভাবে শুনেছি তার বিপরীত। অতঃপর আমি তার হাত ধরে রাসূল (সঃ)-এর নিকট নিয়ে আসলাম তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমরা উভয়েই সঠিক।

শুবা বললেন, আমি ধারণা করলাম রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমরা মতভেদ করো না ইতিপূর্বে যেসব জাতি তোমাদের পূর্বে মতভেদে লিপ্ত হয়েছিলো তারা ধ্বংস হয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য আজকাল খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ে পারস্পরিক মতপার্থক্য পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছে। যা সাধারণ মুসলমানদেরকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করার পরিবর্তে হতাশ করছে। ছোটখাটো মতপার্থক্য স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে সর্বস্তরের ইসলামপন্থীদের ঐক্য সকলের কাম্য।

(প্রবন্ধটি ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সাউদ বিন আব্দুল আজিজ আল হুনাইন কর্তৃক বিশেষ শরীয়াহ কোর্সে প্রদত্ত বক্তব্যের আলোকে লিখিত)

www.nagorikpathagar.org

একাধিক ইসলামী দল ও ইসলামী ঐক্য

রাস্তায় চলতে গেলে অনেক যানবাহন দেখা যায়। বাস, ট্রেন, উড়োজাহাজ, লঞ্চ, ষ্টীমার প্রভৃতি। আবার বাসের সংখ্যাও অনেক চোখে পড়ে। প্রত্যেকে আপন গন্তব্যস্থলে যাওয়ার জন্য নিজস্ব সামর্থ ও সুবিধা অনুযায়ী 'বাহন' ব্যবহার করে। কাউকে বলতে শুনি না এত যানবাহন কেনো? সব মিলে একটা না হল আমি কোনো বাহনেই উঠব না, বরং ঘরে বসে থাকবো। একটি শহরে বা গ্রামে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকে। স্কুল, মাদ্রাসা অনেক প্রতিষ্ঠান। আবার স্কুলের মাঝেও কিন্ডার গার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম, সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রত্যেকে আপন সন্তানকে বা নিজে নিজস্ব ভবিষ্যত টার্গেটকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করায় বা হয়। কেউ বলেনা এতো প্রতিষ্ঠান কেনো? সব প্রতিষ্ঠান মিলে এক প্রতিষ্ঠান রূপান্তরিত করা না হলে 'সন্তানকে মূর্খ রাখবো বা নিজে অজ্ঞ থাকবো।' যে কোনো রেষ্টুরেন্টে হরেক রকমের খাবার থাকে। মিষ্টির মাঝেও নানা জাতের মিষ্টি। আপন রুচি অনুযায়ী 'টক-ঝাল-মিষ্টি' আমরা গ্রহন করি। নানা জাতের খাবার দেখে খাবার গ্রহন থেকে বিরত থাকতে কাউকে দেখা যায় না। একজন অসুস্থ ব্যক্তি আরোগ্য লাভের জন্য হোমিওপ্যাথিক, এ্যালোপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক থেকে নিজের অনুরাগ অনুযায়ী যে কোনো ধরনের ঔষুধ গ্রহণ করেন। হোমিওপ্যাথিক সিস্টেম ও এ্যালোপ্যাথিক সিস্টেম মিলে এক পদ্ধতির ঔষুধ তৈরী করা ন হলে ঔধুধ বিনে মারা যাবো' অমন কথা কেউ বলে না। কিন্তু দেশে একাধিক ইসলামী দল কেনো, সব ইসলামী দল মিলে একদল না হলে কোন ইসলামী দল করবো।' এজন্য অনেককে বলতে শুনি, "এতো ইসলামী দল কেনো ভাই? তাই আমি কোনো দল করিনা। আপনারা সবাই এক হন তারপর করবো।" এমন কথা প্রায়ই প্রতিটি এলাকায় শোনা যায়। আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে একাধিক ইসলামী দল থাকতে পারবে কিনা? একটি এলাকায় যেমন একাধিক মসজিদ থাকতে পারে তেমনি একাধিক ইসলামী দল থাকাও যুক্তিযুক্ত। "আমাদের এলাকায় এতো মসজিদ কেনো? সব মসজিদ ভেঙে এক মসজিদ করা না হলে আমি নামাজই পড়বো না কিংবা আজানের সময় মসজিদে না গিয়ে সিনেমা হলে যাবো' এমন কথা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন না, তাহলে একাধিক ইসলামী দল থাকার কারণে কোনো ইসলামী দল না করা কিংবা ইসলাম বিরোধী দলে যোগ দেয়া কিভাবে যুক্তিযুক্ত ও বুদ্ধিবৃত্তিক হতে পারে? আল্লাহর রাসূলের যুগে সকল সাহাবীই (রাঃ) এক জামাতের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তৎপরবর্তী যুগে বিভিন্ন মাযহাবর উদ্ভব হয়। ইসলামের মৌলিক নীতিমালাকে সামনে রেখে বিভিন্ন বিষয়ে 'ইজতিহাদ' কেন্দ্রিক মাযহাবের বা নানা মতের প্রকাশ ঘটে। এ ক্ষেত্রে একটি মতের বিপরীত আরেকটি মত থাকলেও একজন ইমাম আরেক জন ইমামের বিরোধী ছিলেন না, সকলেই ছিলেন ইসলামের খাদেম বা সেবক। একে

www.nagorikpathagar.org

অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ী (রহঃ)-এর মধ্যকার অনেক ঘটনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আজকের যুগে যারা ইসলাম কায়েম করতে চান তারা পরস্পরের প্রতি কি শ্রদ্ধাশীল? এখনও অনেককে প্রকাশ্য জনসভায় আরেকটি ইসলামী দলের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে শোনা যায়। এতে কি ইসলামের কোনো উপকার হচ্ছে? রাস্তায় অসংখ্য যানবাহন। এসব বাহনের মালিক অনেক। অনেক ক্ষেত্রে তাদের মাঝেও রয়েছে ঐক্যের বন্ধন। যেমন কোনো বাস দুর্বৃত্তদের হাতে আক্রান্ত হলে বাস মালিক সমিতির সকলেই ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী দেয়। আপসোস হচ্ছে, ইসলামপন্থী কারো উপর আঘাত আসলে সবাই ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী দেয়া সম্ভব হয় না। আমি মনে করি একাধিক ইসলামী দল থাকা স্বাভাবিক। সব ইসলামী দল মিলে একটি 'দল' হওয়া বাস্তবসম্মত নয়। কারণ কৌশলগত বিষয়ে একেক দলের একেক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু ইসলামী ঐক্য জনগণের দাবী। যেখানে দেশী-বিদেশী ইসলাম বিরোধী শক্তি তাদের ছোট-খাটো মতভেদ ভুলে ঐক্যকে সুদৃঢ় করছে সে মুহূর্তে ইসলামী উম্মাহর ঐক্য যেমনি প্রয়োজন তেমনি দেশীয় প্রেক্ষাপটে ইসলামী দলগুলোর ঐক্য একান্ত আবশ্যক। জনগণ ইসলাম ভালোবাসে তাদের এ ভালোবাসাকে কার্যকর শক্তিতে পরিণত করতে হলে সকল ইসলামী মহলের আন্তরিক ভূমিকা জরুরী। আর পারস্পরিক বিষোদগার নয় ইসলামের মৌলিক ইস্যুকে সামনে রেখে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই বর্তমান সময়ের দাবী।

ইকামতে দ্বীনের কাজ সবার উপর ফরজ

আমরা জানি, ইকামতে সালাতের ন্যায় ইকামতে দ্বীনের প্রচেষ্টা ফরজ। আল্লাহ কুরআনে আকিমুসসালাত-এর কথা বলেছেন। তাই আমরা সবে মিলে নামাজ আদায় করি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে ইকামতে সালাতের দায়িত্ব আনজাম দিতে হলে ইকামতে দ্বীন জরুরী। যেহেতু আজকের সমাজে দ্বীন কায়েম নেই তাই আন আকিমুদ্দীন কুরআনের এ বাণীর বাস্তবায়নে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা ফরজ। ইসলামের কিছু বিষয় ব্যক্তিগতভাবে ফরজ আবার কিছু বিষয় সমষ্টিগত ফরজ কেউ পালন করলে ব্যক্তির ফরজ আদায় হয়ে যায়। যেমন ৫ ওয়াক্ত নামায সকল ব্যক্তির উপর ফরজ। জানাযার নামায ফরজে কিফায়া সকলের পক্ষ থেকে কেউ পালন করলে সবার দায়িত্ব পালন হয়। কিন্তু কেউ পালন না করলে সবাই দায়ী থাকবে। দ্বীন কায়েমের চেষ্টা ব্যক্তিগতভাবে সবার উপর ফরজ। এ ফরজ আদায় না করলে সকলকে জবাবদিহি করতে হবে।

ইকামতে দ্বীনের জন্য প্রয়োজন সংগঠন

ইকামতে দ্বীনের কাজ ব্যক্তির উপর ফরজ। এটা সাংগঠনিক বা সমবেতভাবে আদায় করতে হয়। কোনো সমাজে যদি একাধিক ব্যক্তি ইকামতে দ্বীনের চেষ্টা করেন তাদেরকে জামাত বা সংঘবদ্ধভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে হয়। যদি কেউ মনে করেন অমুক জামাতে দুর্বলতা আছে তাহলে সে দলের দুর্বলতা দূর করা

www.nagorikpathagar.org

কিংবা তার চেয়ে উত্তম দল গঠন করে ইকামতে দ্বীনের কাজ করা ফরজ। দুনিয়াতে কাউকে এ দায়িত্ব পালন করতে দেখা না গেলেও নিজকে এগিয়ে আসতে হবে এ দায়িত্ব পালনের জন্য। মনে রাখতে হবে, ইসলাম এমন এক মহান আদর্শ যা এককভাবে কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে সমাজে পূর্ণাঙ্গ রূপায়িত হতে পারে না। ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপ প্রকাশ পায় রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আদর্শিক চেতনাবাস্তবায়নের মাধ্যমে। আর কোনো সমাজের রাষ্ট্র কাঠোমো এককভাবে চালানো সম্ভব নয়। মূলতঃ আল্লাহর দ্বীন কায়েমের কাজ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে আদৌ সম্ভবপর নয়। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন, "ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিয়া" অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সংঘবদ্ধভাবে আকড়িয়ে ধরো। হযরত ওমর (রাঃ) যথার্থই বলেছেন, 'লা ইসলামা ইল্লা বিল জামায়াত। সংগঠন ছাড়া ইসলাম জায়েয হতে পারে না। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সংগঠনের গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্য থেকে তিনজন যদি ভ্রমণে বের হও তাহলেও একজনকে আমীর বানিয়ে নাও।" রাসুলে কারীম (সাঃ) এর সকল সাহাবী একই জামাতের অনুসারী ছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের কারণে নানা মত ও দলের উদ্ভব হয়।

একাধিক মত একাধিক দল ও সংগঠন

রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর আদর্শ ব্যক্তি জীবনে অনুসরণের মাধ্যমে সমাজ জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে তার বাস্তবায়নই প্রতিটি ইসলামী দলের মূল কর্মসূচী। এরই মাধ্যমে ক্ষমতার স্বাদ ভোগ নয় আল্লাহর সন্তোষ অর্জনই মূল লক্ষ্য। যে মানুষ একনিষ্ঠতা এবং আন্তরিকতার সাথে দ্বীন প্রতিষ্ঠাকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে আখিরাতের মুক্তির পথ বলে ঘোষণা দিয়েছে তার দিল দেমাগ, মন-মগজ সব সময়ই পেরেশান থাকে কিভাবে কোন পদ্ধতিতে আমাদের সমাজে ইসলাম কায়েম করা যায়। ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টাকে যারা ফরজ মনে করেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৌশলগত বিষয়ে তাদের একাধিক মত থাকতে পারে। ইসলামের ফিকহী বিষয়েও একাধিক মত বিদ্যামান। এর কারণ হচ্ছে–

(ক) রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর হাদীস অনুধাবনে পার্থক্য। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাঃ)-কে দেখে তার তরিকা অনুসরণ করতেন। যেমন তিনি কিভাবে অজু করছেন, নামায পড়ছেন। অজুর ক্ষেত্রে ফরজ কয়টি এতে পার্থক্য নেই। মাথা মছেহ করা সকলের দৃষ্টিতে ফরজ। কিন্তু কতটুকু মছেহ করা ফরজ এ নিয়ে ইমামদের নানা মত রয়েছে।

(খ) রাসূলে কারীম (সাঃ) স্থান-কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। একবার তাকে প্রশ্ন করা হলো, "আইয়্যুল আমালি আফজাল" আমল সর্বোত্তম কোনটি? তিনি জবাব দিলেন "আসসালাত" নামাজ। (তাদের মাঝে নমাজের গাফলতি ছিলো) আবার অন্য সময়ে একই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, "আল জিহাদ" অর্থাৎ জিহাদই হচ্ছে সর্বোত্তম আমল।

www.nagorikpathagar.org

(গ) রাসূলে কারীম (সাঃ) এর কাজের ধরণ নির্ণয়ে পার্থক্য। তারা নবী করীম (সাঃ) কে কোনো কাজ করতে দেখেছেন। কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে মুখে কিছু বলেননি। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী সুন্নাত মুবাহ মনে করেছেন।

(ঘ) বিশ্লেষণে পার্থক্য ঃ রাসূলে (সাঃ) একবার বলেছেন, 'অমুক জায়গায় গিয়ে তোমাদেরকে আসরের নামাজ আদায় করতে হবে।' তার এই নির্দেশ বাস্তবায়নে দু'টি গ্রুপ সৃষ্টি হয়। একটি গ্রুপ আসর নামাজ সেখানে গিয়ে পড়েন বটে নামাজের সময় চলে যায়। আরেকটি গ্রুপ মনে করেন এটা দ্রুত যাওয়ার জন্য তাগিদ দিয়েছেন তাই তারা পথিমধ্যে নামাজ আদায় করে নেয়।

(ঙ) অনেক সময় হাদীসের কোনো শব্দের একাধিক অর্থ থাকে। এ অর্থ নির্ণয়ে অনেকের মাঝে মতপার্থক্য দেখা যায়।

(চ) কারণ নির্ণয়ের পার্থক্য– মৃত ব্যক্তির কফিন অতিক্রম কালে দাঁড়ানো নিয়ে মতেভেদ আছে। কারো মতে, কফিনের সাথে ফেরেশতারা থাকেন। ফেরেশতাদের সম্মানে দাঁড়ানো হয়। কারো মতে মৃত্যু ভয়ের কারণে দাঁড়াতে হয়। কেউ বলেন একবার একজন ইহুদীর কফিন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, রাসূল (সাঃ) বসা ছিলেন। তিনি তার মাথার উপর দিয়ে ইহুদীর লাশ অতিক্রম করা পছন্দ করলেন না। তাই দাঁড়ালেন। এ জন্য সকল কফিনের জন্য দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই। (দ্রষ্টব্যঃ মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে ইসলামের 'ফুরয়ী' বিষয়ে একাধিক মত থাকতে পারে। তেমনিভাবে 'ইকামতে দ্বীনের কাজ ফরজ। এ ফরজ আদায়ের কৌশলগত মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। সকলের উদ্দেশ্য এক হলেও উদ্দেশ্য হাসিলের কর্মপন্থা ভিন্ন। আবার একই দলের মধ্যেও নানা ধরনের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে দেখা যায়। ইসলামী আন্দোলন শুধু নয় যে কোনো আন্দোলনেই 'তাত্ত্বিক' বিষয়ে অনেক ধরনের মতপার্থক্য দেখা দেয়। এ মতপার্থক্য কেন্দ্রিক সংগঠনের সংহতি বা ঐক্য বজায় রাখা অনেক সময় সম্ভব হয় না। আবার অনেক সময় অনেকে ভিন্নমত পোষণ করে দল ছেড়ে 'রাজনীতিমুক্ত' থাকার চেষ্টা করেন। ইসলাম রাজনীতিমুক্ত দ্বীন নয়। দ্বীনের আলোকেই সবকিছু করতে হবে। তাই দ্বীন কায়েমের সংগ্রাম থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত থাকার সুযোগ নেই। কোনো সময় যদি সংগঠনের কোনো পলিসি তার দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত হয় তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে নিতে হবে। তা যদি মেনে চলা তার পক্ষে সম্ভব না হয় তিনি নিজের মত অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন তাহলে তার মতের সমর্থকদের নিয়ে পৃথক জামাত গঠন করে হলেও 'দ্বীন কায়েমের' চেষ্টা করতে হবে।

একাধিক ইসলামী দল থাকা দোষণীয় নয়। দোষনীয় হচ্ছে একের বিরুদ্ধে অপরের ফতোয়াবাজি। কার জামা কতটুকু লম্বা বা ছোট এ ধরণের ছোট-খাটো

www.nagorikpathagar.org

বিষয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি না করে যে যতোটুকু পারেন তিনি যদি দ্বীনের খিদমত করে যান তাহলে দ্বীনী আন্দোলন উপকৃত হবে। কারো ভালো দেখলে দরদভরা মন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দলকেও নিঃসংকোচে ক্রুটি সংশোধনের মানসিকতা রাখতে হবে। যদি সকল ইসলামী দল ও মহল নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে দ্বীনের জন্য একে অপরের পরিপূরক শক্তি হিসেবে কাজ করেন তাহলে একাধিক ইসলামী দল থাকলেও জনগণ বিভ্রান্ত হবে না। ইসলামী দলগুলো ইসলাম কায়েমের স্বার্থে সকল ক্ষুদ্র বিভেদ ভুলে গিয়ে ইসলামের মৌলিক ইস্যুতে কমন কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে।

ইসলামী ঐক্য সময়ের দাবী

ইসলামী একাধিক দল থাকা স্বাভাবিক হলেও জনগণ অস্বাভাবিক মনে করে যখন ইসলামী দলগুলোর মাঝে পারস্পরিক অনৈক্য লক্ষ্য করে। ইসলামী ঐক্য যে ইসলাম বিরোধীদের চক্রান্ত নস্যাতে কার্যকর শক্তি তার প্রমাণ নিকট অতীত ও দূর অতীতে রয়েছে। অতি সম্প্রতি ইসলামপন্থীদের বাধার কারণে সুন্দরী প্রতিযোগিতা আয়োজনকারীরা পিছু হটেন। কারণ এ ইস্যুতে বিভিন্ন ইসলামী দল সোচ্চার আওয়াজ তোলে। তসলিমা নাসরিন ইস্যুতে সকল ইসলামী মহলের প্রতিবাদের ফলে সে বিদেশে যেতে বাধ্য হয়। সম্প্রতি বোরকা পরে দেশে ফিরলেও আত্মগোপন করে আছে। দেশে তার ঠাঁই নাই। কারণ ইসলামী শক্তি তার বিরুদ্ধে সোচ্চার। ইসরাইলের তাতিয়ানা নামক মহিলার ন্যক্কারজনক ভূমিকার বিরুদ্ধে যখন সবাই সোচ্চার হয় তখন জাতীয় সংসদে নিন্দা প্রস্তাব নিতে বাধ্য হয়। বাটা জুতায় আল্লাহ আকবার লিখা দেখে রাজপথে নেমে আসে সকল ইসলামী শক্তি। বাবরী মসজিদ প্রসঙ্গে দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে জনতার গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। মুজিব আমলে দাউদ হায়দার রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কবিতা লিখে আজও দেশের মাটিতে আসার স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছেন না। এ সবই ইসলামী দলগুলোর ভূমিকার সুফল। দূর অতীতে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হন। এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। ফলে ইন্দিরা গান্ধী নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। আজকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যেভাবে নানা মুখী চক্রান্ত চলছে পুরো মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এমতাবস্থায় বিশ্বের সকল দেশের ইসলামী আন্দোলন সমূহকে ন্যূনতম কিছু ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখা আবশ্যক। যেমন Mass Media প্রচার মাধ্যমে যেভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হয় তার প্রতিকার কল্পে বিকল্প চিন্তা করা প্রয়োজন।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মোকবিলায় সকল দেশের ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে আসা দরকার। ক্ষতিকর তৎপরতা মোকবিলায় প্রয়োজন বলিষ্ঠ ভূমিকা। প্রত্যেক দেশের সকল ইসলামী দল নিজেদের মধ্যে সমঝোতা, আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এসকল ক্ষেত্রে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারে। আমাদের দেশ

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ। এ দেশের মানুষ অনেক শ্লোগান, অনেক দফা, অনেক তন্ত্রমন্ত্রের কথা শুনেছে। কিন্তু বারবার প্রতারিত হয়েছে। এমতাবস্থায় মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তবে এর জন্য প্রয়োজন ইসলামপন্থীদের ঐক্য। '৮০'র দশকে ঐক্য প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর আমীর প্রফেসর গোলাম আযম 'ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন' বই লিখেন। এতে সকল ইসলামী মহলকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। কিছুদিন পরে ইত্তেহাদুল উম্মাহ্ গঠিত হয়। দেশের প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামের একটি বিরাট অংশ ইত্তেহাদুল উম্মাহ্র ডাকে সাড়া দেন। কিন্তু কার্যকর সফলতা আসেনি। পরবর্তীতে ইসলামী ঐক্য জোট নামে আরেকটি ব্যানারে ঐক্য প্রয়াস চলে। মূলতঃ এ দুটি ব্যানারে ঐক্য প্রচেষ্টা চললেও ঐক্যজোটের ঐক্যও পরবর্তীতে বহাল থাকেনি। বর্তমানে এ দুটি ব্যানারের কোনোটির মাধ্যমে যে 'ঐক্য' সম্ভব নয় তা সুস্পষ্ট। এমতাবস্থায় সকল ইসলামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক। ঐক্যের বুনিয়াদ হিসেবে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে–

(এক) ইসলাম ঐক্যের দিকদর্শন। ইসলামের বুনিয়াদ ৫টি। এ ৫টি বুনিয়াদে বুনিয়াদী শিক্ষাই হচ্ছে ঐক্য। যারা কালেমায় বিশ্বাসী, আল্লাহকে রব হিসেবে মানে, রাসূলকে (সাঃ) নবী ও রাসূল হিসেবে স্বীকার করেন, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী, কুরআন ও হাদীস কে হিদায়াতের উৎস হিসেবে মনে করেন, সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ইসলাম কায়েমের উদ্দেশ্যে তাহলেই রাসূল (সাঃ) এর আদর্শ কায়েম সম্ভব হবে। মাওলানা আবদুল রহীম এ প্রসঙ্গে যথার্থ বলেছেন, "ঐক্যবদ্ধ ইসলামী আন্দোলন ছাড়া রাসূলে কারীম (সঃ) এর উপস্থাপিত আদর্শ কায়েম করা যাবে না --- ঐক্যবদ্ধ ইসলামী আন্দোলন চালাতে হবে। ঠিক যেমন নবী করীম (সাঃ) মক্কী জীবনে আন্দোলন করেছিলেন যার ফলে তার নেতৃত্বে ইসলামী হুকুমাত কায়েম হয়েছিলো।" রাসূল (সাঃ) মদীনায় হিজরতের পর মদীনা সনদের মাধ্যমে মদীনার হেফাজতের উদ্দেশ্যে অন্যদের সাথেও ঐক্য করেছিলেন।

(দুই) পারস্পরিক সহনশীলতা এবং অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। আমাদের দেশের অনেক ওলামায়ে কেরাম দুঃখজনকভাবে অপরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে জনসভায় বিষোদগার করেন। এটা ইসলামের জন্য ক্ষতিকারক।

(তিন) অন্ধ বিরোধিত পরিহার করতে হবে।

(চার) যুক্তিভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক মতপার্থক্য ঘুচানোর চেষ্টা করতে হবে।

(পাঁচ) গঠনমূলক সমালোচনাকে বিদ্বেষের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ না করে পরস্পরের প্রতি শুভাকাঙ্খীর দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে হবে।

(ছয়) ইসলামের উপর আঘাত আসলে ঐক্যবদ্ধ যুগপৎ আন্দোলন'বা তৃতীয় ব্যানারে একই মঞ্চে এসে সকল ইসলামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী দিতে হবে।

(সাত) ছোটখাটো বিষয়ে মতভেদ পরিহার করে মৌলিক বিষয়ে ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

ঐক্যের পেছনে প্রতিবন্ধকতা

ইসলামী ঐক্য সকলের কাম্য। কিন্তু কার্যকর ঐক্য হচ্ছে না। এর কারণ কি? আমি মনে করি ইসলামী ঐক্য হচ্ছে না ইসলাম বিরোধীদের চক্রান্তের কারণে। তারা চায় না সকল ইসলামপন্থী এক হোক। তাই একের বিরুদ্ধে অপরকে লাগাবার জন্য নানা কৌশল ব্যবহার করছে ইসলাম বিরোধী শক্তি। তারা অনেক সময় প্রকাশ্যে বিরোধিতা করতে পারে না। তাই কাউকে ইসলামের লেবাস ধারণ করিয়ে বিরোধিতার পথ বেছে নেয়। এটা তাদের অতীত চরিত্র। রাসূলে করীম (সাঃ)-এর যুগে সমজিদে নববীতে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তালিম দিতেন। মুনাফেকরা ভাবলো প্রকাশ্য বিরোধিতা করা যাবে না। তাই তারা আরেকটি 'মসজিদ' নির্মাণের উদ্যোগ নিলো। তাদের গোপন উদ্দেশ্য ছিল এ কৌশলে মসজিদে যারা নামায পড়তে যাবে তাদের বিভ্রান্ত করা সহজ হবে। এ মসজিদ প্রসঙ্গে যেনো কোনো প্রশ্ন না থাকে তাই আল্লাহ-রাসূলের (সঃ) মাধ্যমে উদ্বোধনের কৌশল গ্রহণ করলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাবুক থেকে ফিরে এসে উদ্বোধন করবেন বলে মনস্থ করলেন। পথিমধ্যে অহী নাজিল হলো। এ মসজিদকে 'মসজিদে জেরার' আখ্যায়িত করে ভেঙ্গে ফেলার হুকুম জারী হলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। সূরা তাওবায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আজকের যুগে 'ইসলামের' নামে ইসলামের ক্ষতি করার জন্য আন্তর্জাতিক চক্রান্তে কাজ চলছে। এ চক্রান্তের ফলেই ঐক্য হচ্ছে না, কারণ তাদের তল্পীবাহকরা উপরের নির্দেশে চলে।

আমাদের দেশে সর্ববৃহৎ ইসলামী আন্দোলন হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) প্রসঙ্গে এদেশের কেউ কেউ কিছু অভিযোগ করেন। এসব অভিযোগের অনেকগুলো ফিকহী মাছায়েল সংক্রান্ত। ফিকহী মাছায়েলের ক্ষেত্রে ইমামদের নানা মত আছে থাকতে পারে। আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে কথিত অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমান করে কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ কর্তৃক রচিত 'জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতার অন্তরালে' ,মাওলানা বশিরুজ্জামান কর্তৃক লিখিত 'সত্যের আলো', আবদুল মান্নান তালিব কর্তৃক সম্পাদিত 'মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জওয়াব' শীর্ষক বইসমূহে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর আমীর প্রফেসর গোলাম আযমকে প্রশ্ন করা হলে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, "আমরা মাওলানা মওদূদীর অনুসারী নই, কুরআন-হাদীসের অনুসারী। একটি উলামা বোর্ড গঠন করুন, আমাদের কোথায় ত্রুটি আছে তা কুরআন-হাদীসের আলোকে চিহ্নিত করে ধরিয়ে দিন, আমরা ত্রুটি সংশোধন করতে প্রস্তুত।" কিন্তু তাঁর প্রস্তাবের পর কেউ আজ পর্যন্ত এগিয়ে আসেননি।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের দেশে যখন যারা ক্ষমতায় থাকেন তারা ইসলামপন্থীদের একটি গ্রুপকে আরেকটি গ্রুপের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন। কাউকে কাউকে সুযোগ সুবিধা দেয়ারও চেষ্টা করেন। কোনো সময় ঐক্য প্রচেষ্টা নস্যাতে একশ্রেণীর পুঁজিপতিরা কাজ করেন। তারা কারো সাথে এমন খাতির সৃষ্টি করেন যার ফলে তারা অন্য কোনো দিকে ঘুরতে পারেন না। আমার এ পর্যবেক্ষণ ভুল প্রমাণিত হোক এটাই কামনা করি। তবে এসব কারণে যেনো ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা অকার্যকর না হয় সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

সত্যিকার ইসলামী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

(১) কুরআন-হাদীস ইসলামী আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালনার মূল উৎস হবে।

(২) শুধুমাত্র দ্বীনের কিছু খিদমত নয়, পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের অনুশীলন ও বাস্তবায়নই হবে মূল কাজ।

(৩) নবী রাসূলদের অনুসৃত পদ্ধতির অনুসরণ।

(৪) ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও দুনিয়া পরিচালনার যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী বাহিনী গঠনের কর্মসূচী থাকবে।

(৫) নেতৃত্ব লোভহীন হবে। ত্যাগের মানসিকতা থাকবে।

(৬) আদর্শের প্রতি আপোষহীন হতে হবে।

(৭) প্রতিকূলতা থাকবে, জুলুম নির্যাতন মোকাবিলায় সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে।

দেশে অনেক ইসলামী দল দেখে 'দলমুক্ত' থাকার সুযোগ নেই। আপনার বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী যে দলটি কুরআন-সুন্নাহর সঠিক অনুসারী বলে আপনি মনে করেন সে দলে অন্তর্ভূক্ত হওয়া জরুরী।

www.nagorikpathagar.org

বাইয়াত

বাইয়াত কী

'বাইয়াত' আরবী শব্দ, অভিধানে এ শব্দটির মূল অর্থ বিক্রয় উল্লেখ করা হলেও ক্রয় বিক্রয় উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও চুক্তি, শপথ, বেচাকেনা, শ্রদ্ধা প্রদর্শন, আনুগত্য স্বীকার, লেনদেন, Agreement, Commitmant, Comercial transaction, অঙ্গীকার প্রভৃতি অর্থে প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং বাইয়াত মানে আল্লাহর নিকট জান-মাল বিক্রয় করা, আল্লাহর মর্জিমত চলার শপথ গ্রহণ, জান্নাতের বিনিময়ে জান-মাল আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করার চুক্তি, মহান সার্বভৌম আল্লাহর আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনের প্রতিশ্রুতি, জিহাদের ময়দানে অটল ও অবিচল থেকে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মৃত্যুর অঙ্গীকার। নফসের ওয়াসওয়াসা নিয়ন্ত্রন করে ঈমানের দাবী পূরণের মাধ্যমে আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের পথে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে বাইয়াতের অধীন জীবন যাপন অপরিহার্য। মূলতঃ আমাদের জানমালের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তাঁর ইচ্ছা ও আদেশে জীবন মৃত্যু হয়। তিনি এসব আমাদের কাছে আমানত রেখেছেন। ফেতনা ফাসাদ নির্মূলে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আল্লাহর মর্জিমত এসব ব্যবহারে আমরা চুক্তিবদ্ধ। দুনিয়ার জীবনে পরস্পরের কোন চুক্তি, কিংবা একটি দেশের সাথে সম্পাদিত আরেক দেশের চুক্তি সমূহ পূরণে আমরা খুবই আন্তরিক, চুক্তির শর্তাবলী পূর্ণ কিংবা আংশিক লংঘন হলে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। অথচ আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি পূরণে আমরা সবাই গাফিল। বাজারে কোন কিছু বিক্রি করে দেবার পর আমাদের ভোগের অধিকার চলে যায়, অথচ আল্লাহর কাছে জানমাল বিক্রি করে দেবার পরও আমাদের মর্জিমত এসব ব্যবহার করছি– আল্লাহ এতে সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হচ্ছেন সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করছি না। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর ঈমান আনার অর্থই ছিল আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। তারা রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্যের খাতিরে মাতা-পিতা, সন্তান-সন্তুতি, আত্মীয়-স্বজন, সহায় সম্পদের মায়া ত্যাগ করতে সমান্যতম দ্বিধা বোধ করতেন না। তারা সকল কিছুর চেয়ে আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতেন। আজকের যুগেও জাগতিক স্বার্থে কিংবা মানব রচিত আদর্শ বাস্তবায়নে কারাবরণ, ফাঁসীর কাষ্ঠ, শত নির্যাতন ভোগ, নেতৃত্বের নির্দেশে হাসি মুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে দেখা যায়। একথা বাস্তব সত্য বলে আমাদের কাছে প্রমাণিত কোন সুরম্য ভবন তৈরী করতে যেমন ইট, সিমেন্ট, বালি, রড প্রয়োজন তেমনিভাবে কোন আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য দরকার যোগ্যতা সম্পন্ন জানবাজ কর্মী বাহিনী। বিশেষভাবে ইসলামী আন্দোলনের সফলতার জন্য প্রয়োজন এমন তাজাপ্রাণ মর্দে মুজাহিদের যারা লোভ-লালসা উপেক্ষা করে জুলুম নির্যাতন বরণ করে আখিরাতের সফলতার জন্য আল্লাহর রাহে জীবন কুরবান করতে সদা প্রস্তুত থাকে। যারা জীবনের চেয়ে শাহাদাতকে অধিক ভালবাসে।

www.nagorikpathagar.org

বাইয়াত আল্লাহর কাছে জান-মাল বিক্রয়ের চুক্তির নাম

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে বর্ণনা এসেছ। সূরা তাওবার ১১১নং আয়াতে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমীনদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে [দুশমনকে] মারে ও নিজেরাও নিহত হয়। তাওরাত, যবুর ও কুরআনে তাদের জন্য রয়েছে পাকা ওয়াদা। আল্লাহর চেয়ে বেশী ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে ? সুতরাং তোমরা যে বাইয়াত গ্রহণ করেছ সে বিষয়ে সন্তুষ্ট থাক, এটাই সবচেয়ে বড় কামিয়াবী।" উল্লেখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, আমরা জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে জান-মাল বিক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ। আল্লাহ জান্নাত প্রদানের জন্য জান-মাল বিক্রয় করতে সকলকে বাধ্য করেননি। যে সব মুমীন সন্তুষ্ট চিত্তে বিক্রয় করে শুধু তাদের কাছ থেকেই আল্লাহ ক্রয় করেন। তিনি মুমীনের জান-মাল ক্রয় করার সাথে সাথেই নিয়ে নেন না। কারণ তিনি নগদ দাম নিচ্ছেন না। তাই এসব আমানত রাখছেন। আল্লাহ যখনই চাইবেন তখনই দিয়ে দিতে হবে। মুমীন যখন হাসি মুখে নিজেকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করেন আল্লাহ তখন তার উপর সন্তুষ্ট হন।

চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্র : জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ময়দান

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা জুমার ৯নং আয়াতে এবং সূরা নুহের ৩৭ নং আয়াতে 'বাইয়াত' শব্দটি বেচা কেনার চুক্তি অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমরা জানি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা, বিক্রেতা, বিক্রিত বস্তু, বিনিময় ও বিক্রয়ের স্থান আবশ্যক। তেমনি 'বাইয়াত' এর ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয়াবলী সম্পৃক্ত যেমন ক্রয় বিক্রয়ে ২টি পক্ষ থাকে- ক্রেতা-বিক্রেতা। তেমনি বাইয়াত এর ক্ষেত্রেও ২টি পক্ষ রয়েছে– এক পক্ষ বাইয়াত করায়, আরেক পক্ষ বাইয়াত কবুল করে। এ ক্ষেত্রে মুমীনগণ বাইয়াত কবুল করে আর গ্রহণকারী স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীন। সাহাবাগণ রাসূল (সাঃ) এর কাছে বাইয়াত করতেন। অপর দিকে যেমনিভাবে কোন জিনিস-পত্র দাম দিয়ে বাজার থেকে বা নির্দিষ্ট স্থান থেকে ক্রয় করা হয়, তেমনিভাবে জান্নাতের বিনিময়ে জান-মাল বিক্রির চুক্তি বাস্তবায়িত হয় 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র ময়দানে। সেদিকে ইংগিত দিয়েই সূরা তাওবার ১১১নং আয়াতে বলা হয়েছে– 'তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে মারে ও মরে।' সাহাবায়ে কেরাম বাইয়াতের দাবী পূরণে বাসর রাত্রির আয়েশ ছেড়ে তরবারী হাতে নিয়ে জিহাদের ময়দানে ছুটে চলে গিয়েছেন। তাদের দুটি হাত তরবারির আঘাতে কেটে ফেলা হয়েছে তবুও দ্বীনের ঝান্ডা মাটিতে পড়তে দেন নি।

বাইয়াতের উদ্দেশ্য : আল্লাহর সন্তোষ অর্জন

সাহাবাগণ অন্য কোন কারণে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন নি। তারা উসমান (রাঃ)-এর হত্যার গুজব শুনে নিজেদের জীবন উৎসর্গের শপথ নিয়েছিলেন। আল্লাহ তাদের এ ধরনের অনুভুতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সূরা ফাতহ-এর ১৮নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আল্লাহ মুমীনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নীচে আপনার নিকট বাইয়াত নিচ্ছিল।" মূলত: ইকামতে

www.nagorikpathagar.org

দ্বীনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন ছাড়া অন্য কোন কারণে বাইয়াত গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। যদি কেউ জাগতিক স্বার্থে কোন শপথবদ্ধ হয় সে শপথের মাধ্যমে পার্থিব স্বার্থ বা উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে, আখিরাতে তার কোন মূল্য নেই। মূলত: বাইয়াতের মূল কথা হলো–মুমীনের জানমাল, ইচ্ছা বাসনা, যোগ্যতা, প্রতিভা অর্থাৎ তার পূর্ণসত্তাকে আল্লহর নিকট সোপার্দ করা। নিজ ইচ্ছায় জান-মাল আল্লাহর পছন্দানুযায়ী ব্যবহার বিপদজনক। তাই মন মগজ চরিত্রকে ইকামতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য জানমাল কাজে লাগাতে হবে। এ উদ্দেশ্যেই বাইয়াত নিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে বাইয়াত

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর যাঁরাই ঈমান এনেছিলেন তাঁরাই দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সর্বোতভাবে শরীক থাকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। তাঁদের জীবন সে সত্যেরই বাস্তব নমুনা। আমরা নবী করীম (সাঃ) এর সীরাত থেকে জানতে পারি বাইয়াতে আকাবা ও বাইয়াতে রেজওয়ানসহ বিভিন্ন সময় তিনি আনুষ্ঠানিক বাইয়াতও নিয়েছিলেন। নবুয়াতের একাদশ বছরে মদীনা থেকে আগত ৬ জন রাসূলের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা ইসলামের দাওয়াত জাতির কাছে উপস্থাপন করারও অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে ১২জন এসে রাসূল (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তাদের মধ্য থেকে ৫ জন আগের বছর ঈমান এনেছিলেন। নতুন সাতজন ছিলেন মায়াজ বিন হারেস, উবাদাহ বিন সামেত, ইয়াজীদ বিন সালাবা, আব্বাস বিন উবাদাহ আবুল হাইসা, উয়াইস বিন সায়েদা, যাকওয়ান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে কয়েকটি বিষয়ে বাইয়াত গ্রহণ করেন। ১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবনা, ২. চুরি ডাকাতি করবনা, ৩. ব্যাভিচার করবনা, ৪. সন্তান হত্যা করবনা, ৫. কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাবো না, ৬. ন্যায় সঙ্গত বিষয়ে রাসূল (সাঃ) এর অবাধ্যতা করবনা। উক্ত বাইয়াতের পর তাঁদেরকে দ্বীন ও শরীয়াত সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়, শির্‌ক মুক্ত থাকার দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে মদীনা থেকে এক বিরাট দল এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তিনি তাঁদের কাছে ইসলামে দাওয়াত দেবার পর বললেন "আমি তোমাদের কাছে অঙ্গীকার চাই যে তোমরা তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের যেভাবে বিপদ থেকে রক্ষা করে থাক আমাকেও সেভাবে রক্ষা করবে।' তৎক্ষণাৎ তাঁরাও জবাব দিলেন 'হে আল্লাহর রাসূল আমরা আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের যেভাবে রক্ষা করি, সেভাবে আপনাকেও রক্ষা করব।' তারা পাল্টা প্রশ্ন করলেন আল্লাহ আপনাকে বিজয় দান করার পর আপনি কি আমাদের ছেড়ে নিজ গোত্রে ফিরে যাবেন? রাসূল (সাঃ) মুচকি হেসে জবাব দিলেন "আমি তোমাদের জীবন মরণ ও সুখ দুঃখের নিত্য সঙ্গী, আমি চিরকাল তোমাদের থাকবো। তোমরা চিরকাল আমার থাকবে।'

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন উক্ত বাইয়াতের মূল কথা ছিল। ১. অবস্থা কঠিন কিংবা স্বাভাবিক যা হোক না কেন নেতার আনুগত্য ও নির্দেশ মেনে চলব। ২. মুহাজিরদের সব বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করব, ৩. যেখানেই থাকিনা কেন

www.nagorikpathagar.org

আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন করব, ৪. স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছলতা সর্বাবস্থায় আল্লার পথে খরচ করব ৫. আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার পরোয়া করবনা।

মহিলাদের বাইয়াত: ঈমান পরীক্ষার পদক্ষেপ

রাসুল (সাঃ) শুধু পুরুষদের কাছ থেকেই বাইয়াত গ্রহণ করেননি। তিনি নারীদের কাছ থেকেও বাইয়াত নিয়েছেন। হাদীস থেকে প্রমাণিত এ শপথ কেবল হোদাইবিয়ার পরই নয় বরং বারবার হয়েছে, এমনকি মক্কা বিজয়ের দিনও রাসুল (সাঃ) পুরুষদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করে সাফা পর্বতের উপর ওঠে নারীদের কাছে থেকে শপথ গ্রহণ করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাক্যাবলী নীচে সমবেত মহিলাদের পৌঁছিয়েছেন। তখন যাঁরা আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন তাঁদের মাঝে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও ছিল। সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) এ শপথ সম্পর্কে বলেন, মহিলাদের এই শপথ কেবলমাত্র কথাবার্তার মাধ্যমে হয়েছে। হাতের উপর হাত রেখে হয়নি। যা পুরুষদের ক্ষেত্রে হত। তাফসীরকারগণ লিখেন অনেক নারী মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছে মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে কিংবা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে। তাই কারা আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসা এবং সন্তুষ্টির কারণে হিজরত করেছে তা পরীক্ষা করেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সূরা মুমতাহিনার ১২নং আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

বাইয়াত রেজওয়ান : মরণের অঙ্গীকার ও সন্তুষ্টির পয়গাম

রাসূল (সাঃ) যুগে অনুষ্ঠিত আনুষ্ঠানিক বাইয়াত সমূহের মধ্যে বাইয়াতে রেজওয়ান তাৎপর্যমন্ডিত। হুদাইবিয়ার সন্ধি কেন্দ্রীক হযরত উসমন (রাঃ) মক্কার পৌঁছলে মক্কার মুশরিকরা তাকে আটকে রাখে। একজন মুসলমানের রক্ত, জীবন ও মর্যাদার মূল্য আল্লাহর কাছে অনেক বেশী। আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ উপলব্ধি করলেন এই মুহূর্তে নীরব থাকার মানেই হচ্ছে যেখানে সেখানে মুসলমানদের ইজ্জত আবরু নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ করে দেয়া। তাই তারা গাছের তলায় বসে গেলেন। রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের কাছ থেকে কঠিন শপথ নিলেন। হযরত সালমা বিন আকওয়া (রাঃ) বলেন সেদিন সাহাবাগণ মৃত্যুর অঙ্গীকার করেছিলেন। তারা শপথবদ্ধ হয়েছেন মরে যাব তবুও ওসমান (রাঃ) এর রক্ত বৃথা দেতে দেবনা' হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন বিষয়ের উপর আপনারা সেদিন বাইয়াত নিয়েছিলেন, 'তিনি বললেন আমরা সবরের উপর বাইয়াত নিয়েছিলাম–শত্রু যতই শক্তিশালী হউক আমরা ময়দান ত্যাগ করব না।'

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদের এ ত্যাগী মনোভাবে সন্তুষ্ট হলেন। তাঁদের জন্য বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। ইতিহাস সাক্ষী হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ৭ম হিজরীতে খায়বর ও ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় হয়।

www.nagorikpathagar.org

সংগঠনে বাইয়াতের তাৎপর্য

ইসলামী আন্দোলনে যারাই শামিল হন সকলেই ঘাত প্রতিঘাতে জীবন কুরবান করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। আল্লাহর কাছে তারাই নাজাত পাবেন যারা খালিস দিলে দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য আপন মেধা ও যোগ্যতার সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করেন। এজন্য সাংগঠনিক কোন বিশেষ সিষ্টেম অনুসরন জরুরী নয়। তবে যে সকল সংগঠনে বিশেষ স্তর বিন্যাস অধিক উপযোগী মনে করা হয় সে সকল সংগঠনের সাংগঠনিক কাঠামোর কারনে একজন ব্যক্তির মেধা যোগ্যতা, দক্ষতা অভিজ্ঞতা সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরে থেকে উত্তমভাবে কাজে লাগানো যায়না। কেননা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শপথের মাধ্যমে মান উন্নীত জনশক্তিরাই মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। সেক্ষেত্রে যেকোন ব্যক্তির উত্তম পরামর্শ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু তার উত্তম চিন্তার যথাযথ প্রতিফলন সম্ভব নয়। অনেক সময় দেখা যায় অনেকে দ্বীনের বিজয় মনে প্রাণে কামনা করেন, কিন্তু মানোন্নয়নে আগ্রহী নয়, যার ফলে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতা নিয়ে যারা আন্তরিকতার সাথে মাঠে ময়দানে কাজ করেন তাদের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরার ক্ষেত্রে কাংখিত ভূমিকা পালন সম্ভব হয়না। যদি যার যতটুকু যোগ্যতা আছে তা আল্লাহর দ্বীন কায়েমে নিয়োজিত করার জন্য সকলে অগ্রণী ভুমিকা পালন করেন তাহলে কি সার্বিকভাবে আন্দোলন উপকৃত হবে না? আবার অনেকে সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় নিজের মানোন্নয়নের জন্য খুবই আগ্রহী। কিন্তু কাংখিত মানে নিজেকে গড়ে তোলার অভাবে সে আশা পূরণ হয়না। একসময় সে আবেগ উবে যায়। তাই মানোন্নয়নের জন্য মৌলিকভাবে প্রয়োজন–

১. মজবুত সিদ্ধান্ত ও বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ : অনেকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া নিজের মান উন্নীত করতে চান। যদি প্রশ্ন করা হয় কবে হবেন? জবাব দেন হব আর কি 'সময় আসুক' এখন না পরীক্ষা দিয়ে তারপর। এভাবে মাস যায় বছর অতিবাহিত হয়। কিন্তু মানোন্নয়ন সম্ভব হয়না। আপনি যদি সাংগঠনিক মান উন্নীত করতে চান তাহলে আপনার নিজেকে যে মানে উন্নীত করতে আগ্রহী সে ক্ষেত্রে কি কি ঘাটতি আছে তার তালিকা তৈরী করুন। ঘাটতি দূর করার উদ্যোগ নিন।

২. পবিত্র মন ও উত্তম আমলের অধিকারী হওয়া: নিছক সাংগঠনিক মান উন্নয়নের জন্য নয় বরং আল্লাহর প্রিয় গোলাম হিসেবে নিজেকে উন্নীত করার জন্য ব্যক্তিগত আমল, আখলাক সংশোধন করা দরকার। তাই প্রয়োজন :

ক. বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত, আন্তরিকতা সহকারে কুরআন অধ্যয়ন। কুরআনের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা, ব্যক্তি জীবনে কুরআনের বিধান কার্যকর করা। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত মুমীন হৃদয় উজ্জল করে, কিয়ামতে কঠিন বিপদে সুপারিশ করে। কুরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি কিছু কিছু মুখস্থ করার চেষ্টা করা দরকার। **খ.** খুশু সহকারে সালাত আদায়, সাহাবাগণ নামাজের সময় এমন গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন সে সময় শরীর থেকে তীর বের করা হত কিন্তু টের পেতেন না। কখনো নামাজ কাযা যেন না হয় সে দিকে সচেতন থাকতে হবে। অনেক সময় ঘুমের

www.nagorikpathagar.org

কারণে, অলসতায়, বাসে বা ট্রেনে চলাচলের সময় অসতর্কতার কারণে নামায কাযা হয়ে যায়। নামায কাজা নয় বরং জামাতে নামায আদায়ে অভ্যস্ত হতে হবে। গ. নফল ইবাদত, ছদকা, তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হওয়া। ঘ. সার্বক্ষনিক আখিরাত চিন্তা। ঙ. পরিচ্ছন্ন লেনদেন ও আমানতদারীতা। চ. কুপ্রবৃত্তি দমন ও সুপ্রবৃত্তির লালন। ছ. ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ । জ. সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণ।

৩. আত্মগঠন প্রচেষ্টা জোরদার করা দরকার : ব্যক্তিগত পড়াশুনার পাশাপাশি সাংগঠনিক ব্যাপক অধ্যয়ন করা, গুরুত্বপূর্ণ বই Note করা ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে ধারণা পরিস্কার হওয়া, যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দানের যোগ্যতা অর্জন এবং সমকালীন বিশ্ব ও সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে মৌলিক ধারণা থাকা জরুরী।

৪. সাংগঠনিক তৎপরতা ও সংগঠন সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা থাকা আবশ্যকঃ এ জন্য পরিকল্পিত সাংগঠনিক সময় ব্যয় করা, প্রতিদিন নুতুন নুতন ছাত্রের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো, সাংগঠনিক ইতিহাস, ঐতিহ্য অনুধাবন করা, নেতৃত্বের আনুগত্যে দ্বিধা সংকোচ না থাকা, নিয়মিত ব্যক্তিগত Report সংরক্ষন করা আবশ্যক। অনেকে ছুটির সময় কোথাও গেলে, কিংবা অলসতায় মাঝেমাঝে 'রিপোর্ট মুক্ত দিবস বা সপ্তাহ' পালন করেন। আবার কেউ কেউ একাধারে কিছুদিন ভালভাবে Report সংরক্ষণ করে মান উন্নয়নের চেষ্টা করেন, হয়তবা সে সময় কোন দায়িত্বশীল তার রিপোর্ট দেখলেন না, তাই ক্ষোভে অভিমানে বা নিরাশ হয়ে রিপোর্ট সংরক্ষণ ছেড়ে দেন।

৫. দূর্বলতা দূর করা ও যথাযথভাবে আত্মসমালোচনা করা : নিজকে নিজে প্রশ্ন করতে হবে আমার মাঝে কি কি ত্রুটি আছে? আজকের দিন কালকের চেয়ে উন্নত হচ্ছে কিনা? সকল খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে ভাল কাজে অভ্যস্ত কিনা?

৬. সময় শ্রম, অর্থ, আরাম, আয়েশ ত্যাগের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা : যে কোন ধরনের বাধা, বিপত্তি ধৈর্য, সাহসিকতা ও প্রজ্ঞার সাথে মোকাবিলা করা।

৭. আল্লাহর সাহায্য কামনা : হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন আর রাতের বেলায় আল্লাহর দরবারে ধর্না দিতেন। হযরত মুসা (আঃ) তার যোগ্যতা বৃদ্ধি ও পথ প্রশস্ত করে দেয়ার জন্য দোয়া করতেন। আমরা যেন ইকামতে দ্বীনের পথে সত্যিকারভাবে নিজেদের জীবন পরিচালিত করতে পারি এজন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাতে হবে।

৮. ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক কাজে ভারসাম্য রক্ষা করা : রাসূল (সাঃ) ফজরের নামাজ শেষে মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে মুখ ফিরিয়ে বসতেন, তাদের রাত্রিকালীন খোঁজ খবর নিতেন। প্রশ্নের জবাব দান করতেন ও মৌলিক প্রশিক্ষণ দিতেন সেদিনের দায়িত্ব ও কাজ বন্টন করতেন। অত:পর সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সাথে দেখা করতেন। দ্বীনের তাবলীগে বের হতেন, সর্বসাধারণের সাথে মিশতেন, আসর থেকে এশা পর্যন্ত উম্মুল মুমীনীন (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ) সহ নিকটাত্মীয়দের সংগ দিতেন। এশার নামাজের পর ঘুমুতেন। গভীর রাত্রিতে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। রাসূলের জীবন আদর্শ এ শিক্ষা দেয় যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে ভারসাম্য রক্ষা করে নিজের জীবন গঠন করা দরকার। ভারসাম্য রক্ষার জন্য নিরর্থক কথা, কাজ, সময়,

www.nagorikpathagar.org

শ্রম ও অর্থ ব্যয় থেকে বিরত থাকতে হবে, অপ্রয়োজনীয়, অরুচিকর পত্র-পত্রিকা পাঠ, অনুষ্ঠান দেখা বন্ধ করতে হবে। প্রতিটি সেকেন্ড কাজে লাগাতে হবে। চিন্তা করতে হবে প্রতিদিন গড়ে ১ঘন্টা সময় অপচয় হলে বছরে ৩৬৫ ঘন্টা অপচয় হবে। এ সময়ে আপনি কতটুকু তিলাওয়াত বা মুখস্থ করতে পারতেন। আরবী বা ইংরেজী কতটি শব্দ মুখস্থ হত? কয়টি দর্শনীয় স্থান ভ্রমনের অভিজ্ঞতা নেয়ার সুযোগ পেতেন। আরো কত বই পড়তে পারতেন। কতজন আত্মীয়ের খোঁজ নিতে পারতেন? কতজন ছাত্রের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো যেত? কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লিখার অভ্যাস থাকলে কত পৃষ্ঠা পড়তে বা লিখতে সক্ষম হতেন?

বাইয়াতের চূড়ান্ত রূপ 'ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' পাঠ করে শপথ গ্রহণ। শপথের মূল কথাই হচ্ছে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করা, আমরা চাই বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লব সাধন করতে। তাই আমাদের জীবনেও জিন্দেগীকে সে আলোকে গঠন করতে হবে, আমাদের জীবন এমনভাবে গড়তে হবে যাতে মানুষের মনে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয় বর্তমান ঘুনে ধরা বিশ্বেও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। তাই আমাদের ইসলামী নৈতিক শক্তি ও মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা তওবার ১১১নং আয়াতে জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে ক্রয় করে নেয়ার চুক্তি প্রসঙ্গে আলোকপাত করার পর বাইয়াত কবুলকারীদের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে 'আল্লাহর দিকে বার বার প্রত্যাবর্তনকারী [তওবাকারী] তার বন্দেগী পালনকারী, তার প্রশংসাবাণী উচ্চারণকারী, জমীনে পরিভ্রমনকারী, তার সম্মুখে রুকু ও সেজাদায় বিনীত, ভাল কাজের আদেশ দানকারী খারাপ কাজে বাধা দানকারী এবং আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা রক্ষাকারী। উপরোক্ত আয়াতকে সামনে রেখে আমাদের শপথ বিশ্লেষণ পূর্বক বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের কাংখিত মান ও করণীয় নির্ধারণে যে দিক নির্দেশনা পাই তা হচ্ছে ঃ

১. সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দু হবে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন : আমাদের চিন্তা, চেতনা, কথা, কাজ বিশ্বাস, সময় ব্যয়, অর্থদান, জীবন দান সকল কিছুর কেন্দ্র বিন্দু হতে হবে আল্লাহর রেজামন্দী হাসিল। হাদীসে আছে কেয়ামতের দিন একদল আলেম, দানশীল ব্যক্তি ও শহীদকে দোজখে দেয়ার পর তারা প্রশ্ন করবেন কেন দোজখে দেয়া হলো, জবাবে দেয়া হবে তোমরা ইলম শিক্ষালাভ করেছ আলেম বা বিদ্বান হিসেবে খ্যাতি অর্জনের জন্য, দান করেছ দানশীল হিসেবে যশস্বী হবার জন্য, যুদ্ধ করেছ বীর হিসেবে খ্যাতি লাভের আকাংখায়। এসবের পিছনে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন টার্গেট ছিলনা। তাই দোজখে দেয়া হচ্ছে। সকলের কাজের কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহর সন্তোষ অর্জন হওয়া সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

২. আখিরাতে জবাবদিহীর অনুভূতি নিয়ে কাজ করতে হবে: মনে রাখতে হবে জাগতিক সফলতা নয় আখিরাতের সফলতাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। এ কারণে আখিরাতে জবাবদিহী করতে হবে এমন সব কাজ বর্জন করে শুধু সে কাজই করতে

www.nagorikpathagar.org

হবে যার মূল্য আখিরাতে আছে। চিন্তা করতে হবে 'আমরা কানে কি শুনছি চোখে কি দেখছি, মনে কি ভাবছি, হাতে কি স্পর্শ করছি, পা দিয়ে কোথায় গমন করছি, কোন অঙ্গ কোন কাজে ব্যবহার করছি সব বিষয়ে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হব, এসবই আল্লাহর কাছে বাস্তব স্বাক্ষী দেবে।

৩. রাসূল (দ:) এর আদর্শের মূর্ত প্রতীক হওয়া: রাসূল (দ:) কিভাবে কথা বলেছেন, ঘুমিয়েছেন, যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন, সবকিছু জানার ও অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন' তাই কুরআন থেকে জীবন্ত রাসূলের আদর্শ তালাশ করতে হবে এবং বাস্তব জীবনে তাঁর অনুশীলন করতে হবে। আর দুনিয়ার সকল ভালবাসার চাইতে আল্লাহর রাসূলকে অধিক ভালবাসতে হবে। রাসূলের ভালবাসার স্বার্থে প্রয়োজনে পিতা, মাতা, সন্তান, সন্তুতি, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন, ধন সম্পদ, ব্যবসা বাণিজ্য সকল কিছুর মোহ ত্যাগ করতে হবে।

৪. জ্ঞান অনুযায়ী আমল করতে হবে : হাদীসে এসেছে কিয়ামতের দিন ৫টি প্রশ্ন করা হবে, 'হায়াত ও যৌবন কিভাবে কাজে লাগিয়েছ, ধনসম্পদ কিভাবে আয় ও ব্যয় হয়েছে, জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছ' মূলত: দুনিয়াতে জ্ঞানীর অভাবের তুলনায় জ্ঞান অনুযায়ী আমলকারীর অভাব বেশী, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অসহ্য বিষয় হচ্ছে কথা ও কাজে মিল না থাকা।

৫. প্রবৃত্তির চাহিদা দমন করার নৈতিক শক্তি অর্জন করতে হবে: এ কারণেই বলা হয়েছে 'আসাদ্দুল জিহাদে জিহাদুল হাওয়া' প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদই হচ্ছে সর্বোত্তম জিহাদ। আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা ত্যাগ করতে হবে। যেসব কাজ লোক চক্ষুর সামনে করতে লজ্জা লাগে এবং মনে খটকা সৃষ্টি হয় সেসব কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

৬. তাকওয়া মন্ডিত জীবন যাপন করতে হবে: এ প্রসঙ্গে হাদীসে ৯টি কথা বলা হয়েছে। ১. প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলা ২. ক্রোধ ও সন্তুষ্টি সকল ক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ কথা বলা ৩. স্বচ্ছন্দ ও দারিদ্রতায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন ৪. যে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ৫. যে বঞ্চিত করে তাকে দান করা ৬. যে অন্যায় করে তাকে ক্ষমা করা ৭. সৎ চিন্তাযুক্ত নিরবতা ৮. আল্লাহর স্মরণের সাথে সম্পৃক্ত কথা ৯. শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টি।

৭. আস্থাভাজন নেতৃত্বের গুণাবলীর অধিকারী হওয়া : হাদীসে আছে তিন প্রকারের লোকের নামায খোদার দরবারে কবুল হয়না। ১. এমন ব্যক্তি যে লোকদের নেতা হয়েছে বটে, কিন্তু লোকেরা তাকে অপছন্দ করে ২. যে নারী স্বামীর অসন্তুষ্টি নিয়ে রাত্রিযাপন করে ৩. দুই মুসলমান যারা পরস্পরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। নেতৃত্বকে সকলের আস্থা অর্জনের জন্য প্রয়োজন কোমলতা, উদারতা, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি, ময়দানে দৃঢ়তা, সাহসিকতা প্রভৃতি গুনাবলী অর্জন।

৮. পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ : রাসূল (দ:) বলেছেন, সমাজে শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে তিনটি জিনিস দরকার। ১. খোদাভীরু

www.nagorikpathagar.org

অর্জন করতে হবে। বর্তমানে ইন্টারনেট, কম্পিউটার আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী দিন দিন ছোট হয়ে আসছে। মানুষ মঙ্গল গ্রহে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় বিশ্ব জুড়ে হতাশাগ্রস্থ মানুষের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করতে হলে জ্ঞান, বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে এবং নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারের যোগ্যতা লাভ করতে হবে। আল্লাহতায়ালা কুরআনে হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন, 'যাদাহু বাসতাতান ফিল ইলমে ওয়াল জিসমি' আমাদেরকেও শারীরিক ও জ্ঞানগত যোগ্যতার দিক থেকে আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার শক্তি অর্জন করতে হবে।

১৫. আনুগত্য, ত্যাগ ও কুরবানীর ক্ষেত্রে মডেল স্থাপন করতে হবে: রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীগণ রাসূলের ভালবাসার কারণে সবকিছু ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তাইতো হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা বাসর রাত্রির শয্যা ছেড়ে মুতার যুদ্ধে শরীক হয়েছে, হযরত মুসয়াব বিন উমাইর দুই হাত কাটা যাওয়ার পরও বুকে চেপে ইসলামের ঝান্ডা উঁচু রেখেছেন। হযরত হানযালা (রাঃ) নববধুর সহিত রাত্রিযাপন শেষে গোসল শেষ করার পূর্বে ওহুদের ময়দানে ছুটে গিয়েছেন।

বাইয়াতের দাবী পূরণে প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার

বাইয়াতের স্বাভাবিক দাবী হচ্ছে 'আল্লাহর দ্বীনকায়েমে আমরণ সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করা। নিজের সকল কর্মতৎপরতার মাঝে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অধিক তৎপর থাকা। ইসলামের স্বার্থে নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলী দেয়া, শ্রম, অর্থের সর্বোচ্চ কুরবানী পেশ করা। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় আমরা অধিক তৎপর হই, নিজের জাগতিক প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আখেরাতের কথা ভুলে যাই। অথচ আমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠাই জীবনোদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহন করেছি। এর পিছনে মৌলিক যেসব কারণ রয়েছে তা হচ্ছে–

১. দুনিয়ার মোহ, সহায় সম্পদ ও স্ত্রী পুত্র পরিজনের প্রতি আকর্ষণ। রাসূল (সঃ) এ কারণেই বলেছেন, 'হুব্বুদ দুনয়া রা'সু কুল্লি খাতিয়াতিন' দুনিয়ার মহব্বত সব অনিষ্টের মূল। এ প্রসঙ্গে সূরা আল ইমরানের ১৪নং আয়াতে বলা হয়েছে–মানব কুলকে মোহগ্রস্থ করেছে নারী, সন্তান-সন্তুতি, রাশিকৃত স্বর্ণ রৌপ্য, বাছাই করা ঘোড়া, গৃহ পালিত পশু এবং ক্ষেত খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী। বস্তুত: পক্ষে এসবই দুনিয়ার সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী জীবনে সামগ্রীমাত্র। বাস্তবিকই মানুষ ধনমালের লালসায় তীব্রভাবে আক্রান্ত। এ কারণেই সূরা আনকাবুতের ২০নং আয়াতে বলা হয়েছে 'ধন সম্পদের মায়ায় তোমরা খুব বেশী কাতর। এর কারণ প্রসঙ্গে সূরা আ'লার ১৬নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই অগ্রাধিকার দিতেছ, অথচ পরকাল অধিক কল্যাণময় এবং চিরস্থায়ী' আমরা জাগতিক সফলতার জন্য আখিরাতের সফলতার কথা ভুলে যাই, দুনিয়ার পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার জন্য আখিরাতের চূড়ান্ত পরীক্ষায় খারাপ করার পথ প্রশস্ত করি। কিন্তু ভেবে কি দেখছি দুনিয়ার জীবন কত দিনের?

২. ইসলামী আদর্শ মনে প্রাণে গ্রহণ না করে বৈষয়িক স্বার্থে আন্দোলনে শামিল হওয়া। ভাবাবেগ কিংবা স্বার্থ হাসিলের জন্য অগ্রসর হওয়া। এ ধরনের ব্যক্তির স্বার্থে

www.nagorikpathagar.org

নেতৃত্ব ও সরকার ২. দানশীল ও গরীবের বন্ধু ধনী লোক ৩. সর্ব প্রকার সামাজিক ও জাতীয় বিষয় পরামর্শ ভিত্তিক হওয়া। পারস্পারিক পরামর্শে চিন্তার ঐক্য সৃষ্টি হয়, আল্লাহর বরকত নাজিল হয়, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে আল্লাহরকে হাজির-নাজির জেনে মতামত দিতে হবে।

৯. স্বত:স্ফূর্ত আনুগত্য : রাসূল (দ:) বলেছেন মুসলমানদের উপর নেতার আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য এমন সব ব্যপারেই যা সে পছন্দ করে আর যা তার অপছন্দ। কিন্তু যদি কোন নাফরমানী ও গুনাহের কাজে আদেশ করা হয় তবে তা শুনাও যাবেনা এবং মানাও যাবেনা। স্বত:স্ফূর্ত আনুগত্য করার পূর্বশর্ত হচ্ছে ভালভাবে আদেশ শুনা, আর আদেশকারীকেও নির্দেশের সূরে কথা না বলে দরদ মাখা ভাষায় আদেশ দিতে হবে।

১০. সাংগঠনিক পরিবেশ সংরক্ষণ : এজন্য দায়িত্বহীন কথা ত্যাগ করতে হবে, হাদীসে এসেছে, 'কোন ব্যক্তি মিথ্যাচারী হওয়ার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়। লাগামহীন কথা, কুধারণা, দোষখোঁজা, চোগলখোরী, গীবত, হিংসা-বিদ্বেষ, দুমুখোনীতি, আত্মম্ভরিতা, চাটুকারীতা, অপরের অধিকার হরণ প্রভৃতি কারণে পরিবেশ নষ্ট হয়। আর এহতেসাবের মাধ্যমে জান্নাতী পরিবেশ বজায় থাকে।

১১. পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার মধুর সম্পর্ক : আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন সাত ব্যক্তিকে আরশের ছায়া দান করবেন ১. ন্যায়পরায়ন নেতা ২. ঐ যুবক যে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের জীবন যাপন করে বড় হয়েছে ৩. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর ঝুলে আছে মসজিদের সাথে ৪. ঐ দুই ব্যক্তি যারা একে অপরকে আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসে, এ উদ্দেশ্যে তারা একত্রিত হয় আর এ উদ্দেশ্যে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ৫. ঐ ব্যক্তি যাকে পরমা সুন্দরী রমনী আহবান জানালে সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি ৬. ঐ ব্যক্তি যে গোপনে আল্লাহর পথে ব্যয় করে ৭. ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর কথা স্মরণ করে অশ্রুপাত করে।

পরস্পরের কল্যাণ কামনা, উপহার উপঢৌকন, সামষ্টিক ভোজ, প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার, সালাম ও দোয়া বিনিময়, সুখ-দু:খে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

১২. সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জন করা : এজন্য প্রয়োজন দায়িত্বানুভূতি নিয়ে দায়িত্ব আনজাম, সংগঠন নিয়ে সার্বক্ষণিক চিন্তা, সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা, সৃজনশীল গঠনমূলক মতামত পেশ, সকলের প্রাণবন্ত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সংগঠন পরিচালনা, আত্মবিশ্লেষনের মাধ্যমে দূর্বলতা চিহ্নিত করা ও তা দূর করা।

১৩. মান সংরক্ষণ ও মান উন্নয়নে যত্নশীল থাকা : যিনি যে মানে আছেন সে মান সংরক্ষণ করা ও অপরকে সে মানে উন্নীত করার চেষ্টা করা দরকার। এজন্য ব্যক্তিগত সাহচর্য ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে অপরকে এগিয়ে আনতে যত্নশীল ভূমিকা প্রয়োজন।

১৪. শারীরিক, মানসিক যোগ্যতার বিকাশ ও সমকালীন বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ : আমরা বিশ্ব বিপ্লব করতে চাই, এজন্য বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা

www.nagorikpathagar.org

আঘাত লাগলে পিছনে হটে যায়। তারা 'সুদিনে সরব ও দুর্দিনে নীরব থাকে। রাসূল (সাঃ) এর সময়ও অনেকে জিহাদের ময়দান থেকে পিছপা হয়েছেন। আব্দুল্লাহ বিন ওবাই বিন সলুলের নেতৃত্বে একদল মুনফিক ওহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে যায়, কুরআনে তাদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'তারা আল্লাহর নামে হলফ করে বলে যে তোমাদেরই অন্তর্ভূক্ত অথচ তোমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়' [তওবা ৫৬] তাদের সম্পর্কে কুরআনে আরও উল্লেখ আছে পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে, আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে অপছন্দ করেছে' এই মুনাফিক চক্র শুধু নিজেরাই জিহাদ থেকে বিরত থাকতনা বরং অন্যদেরকেও নানা বাহানায় বিরত রাখত। যেমন তবুক যুদ্ধে অনেকেই বলেছে 'এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়োনা।' তাদের এ ধরনের অযৌক্তিক বাহানা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন 'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম [তাওবা:৮৫] এ ধরনের ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে তাওবার ৬২নং আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খায় যাতে তোমাদের রাযী করতে পারে, অবশ্য তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে তবে আল্লাহকে এবং তার রাসূলকে রাযী করা অত্যন্ত জরুরী' যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমানদার তারা দ্বীন কায়েমের পথ থেকে অব্যাহতি কামনা করেনা। সূরা তাওবার ৪৪, ৪৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি যাদেরই ঈমান আছে তারা মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করেনা। আর আল্লাহ সাবধানীদের ভাল জানেন। নি:সন্দেহে তারাই অপরের কাছে অব্যাহতি চায় যারা আল্লাহ ও রোজ কিয়ামতে ঈমান রাখেনা এবং তাদের অন্তর সন্দেহ গ্রস্থ হয়ে পড়েছে সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খাচ্ছে।

৩. বিরোধী শক্তির দম্ভ, হুংকার, চতুর্মুখী বাধা বিপত্তিতে অনেক দুর্বলচেতা ব্যক্তিরা ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু মুমীনের কাজ হলো ভীরুতার নেকাব ছিড়ে অলসতার নিদ্রা ছেড়ে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তাঁরই হাতে জীবন সঁপে দিয়ে জিহাদী তৎপরতায় ঝাঁপিয়ে পড়া। চতুর্দিক থেকে নিক্ষিপ্ত গোলাবারুদ, বিমান ট্যাংকের বহর, মাথার উপরের যুদ্ধ বিমানের ভয়ংকর মহড়া, বোমার বিস্ফোরণ, তাদের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করে না, ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে তারা মানসিক ভাবে ভেংগে পড়েনা। এ প্রসংগে সূরা আল ইমরানের ১৭৩নং আয়াতে বলা হয়েছে 'যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে তোমাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য বহু সাজ সরঞ্জাম সমাবেশ করেছে, তাদের ভয় কর, তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে যায় এবং তারা বলে আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।'

৪. ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার কারণে অনেকে ভেংগে পড়েন। নিজের দায়িত্ব পালনে অমনোযোগী থাকেন, অথচ দায়িত্বশীলকে সমস্যা অবহিত করেননা। কেউ শারীকিভাবে খুবই অসুস্থ, দায়িত্বশীল তা না জানার কারণে কাজ দেন, এতে মন খারাপ করেন, অথচ আল্লাহ অসুস্থ ব্যক্তিদের রুখসত দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পক্ষ থেকে একবার সবার প্রতি জিহাদে শামিল হবার নির্দেশ দেয়া হল।

www.nagorikpathagar.org

এ নির্দেশ শুনার পর জনৈক সাহাবী রাসূলের খিদমতে আরজ করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার পিতা খুবই অসুস্থ, এখন আমি কি করব? তখন রাসূল (সাঃ) জবাব দিলেন 'তোমার পিতার খিদমাত কর।' এ থেকে স্পষ্ট সমস্যা গোপন না রেখে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলকে জানাতে হবে।

৫. অনেক সময় সংগঠনের কোন **Policy** প্রসঙ্গে খটকা সৃষ্টি হয়, এক্ষেত্রে দায়িত্বশীলদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে। নিজের পক্ষ থেকে অবহেলা প্রদর্শন ঠিক নহে। হুদাইবিয়ার সন্ধিকে হযরত ওমর (রাঃ) পর্যন্ত 'অপমানজনক চুক্তি' আখ্যায়িত করেছিলেন। পরবর্তীতে দেখা যায় সে চুক্তির মাধ্যমেই মহা বিজয়ের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

৬. আদর্শ বিজয়ের ক্ষেত্রে কাংখিত ফলাফল না পেয়ে অনেকেই হাতাশ হয়ে পড়েন। মনে রাখতে হবে আদর্শ বিজয়ী করা আমাদের দায়িত্ব নয়, বিজয়ী করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। আমরা আমাদের কর্তব্য পুরোপুরি পালন করলে দুনিয়াতে আদর্শ বিজয় লাভ না করলেও আমরা আখিরাতে সফল হব। আর যদি সর্বাত্মক চেষ্টার ক্ষেত্রে গাফলতি প্রদর্শন করি তাহলে আদর্শ বিজয়ী হলেও আখিরাতে আমরা বিফল হব। যারা আখিরাতে সফলতার প্রত্যাশি দুনিয়ার দৃষ্টিকোনে কোন ব্যর্থতার সম্মুখীন হলেও তারা হতাশ হয়না। তারা জাগতিক যে কোন ধরনের ব্যর্থতা থেকে ত্রুটি সংশোধনের শিক্ষা নেয়, নিরাশ হয়ে ঘরে বসে থাকেনা।

৭. অনৈতিক পরিবেশের কারণে অনেক সময় নৈতিক দুর্বলতা দেখা যায়, যার ফলে নকল করা, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ, ওয়াদার বরখেলাফ, কাজের প্রতি অনীহা, মৌলিক এবাদত সমূহের প্রতি উদাসীনতা সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় নিজের জীবনের সঠিক মূল্যায়ন করে তাওবা ইস্তেগফার ও ইবাদতের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করা দরকার। আখিরাতে জবাবদিহীর অনুভূতি জাগ্রত করে পবিত্র থাকার চেষ্টা করা অবশ্যক। এজন্য তাকওয়ার মান বৃদ্ধি ও আল্লাহর কাছে বেশী বেশী দোয়া করা দরকার।

৮. অনেক সময় নিজের বুঝকে সঠিক বুঝ মনে করে অন্য কারো মত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিরূপ মনোভাব পোষণ, নিজের গুনাবলীকে প্রাধান্য দেয়া, নিজের সমস্যা বড় করে দেখা, নিজের চিন্তা ও প্রচেষ্টাকে নিরঙ্কুশ মনে করার প্রবণতা দেখা যায়। যার কারণে অন্যের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করে বেড়ানো, সংগঠনের শৃংখলা মেনে না চলা, আত্মপূজা আত্মপ্রীতি, প্রদর্শনেচ্ছা ইত্যাদি রোগের জন্মনেয়। এমতাবস্থায় সব কিছুই আল্লাহর দান এটা স্মরণ রেখে নিজের যোগ্যতা ও ক্ষমতার প্রদর্শন ত্যাগ করে নীরবে কাজ করার চেষ্টা করা দরকার। আত্মবিচার ও বন্দেগীর অনুভূতি তীব্র করে দ্বীনি ও সাংগঠনিক পরিবেশ বজায় রাখা আবশ্যক।

www.nagorikpathagar.org

পরিকল্পিত ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ

ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। ইসলামে প্রদর্শিত সকল কিছুই স্বভাব সম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ। মানুষের দেহের অঙ্গ প্রতঙ্গের প্রতি তাকালে খুব সহজেই অনুভূত হয় আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটির সাথে আরেকটির সংযোগ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কি অপূর্ব ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। একটি হাত বা পা খুব লম্বা আরেকটি খুব ছোট করেননি, ব্যতিক্রম যা নজরে পড়ে তা মানুষের শিক্ষার জন্যেই দৃষ্টান্তস্বরূপ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ আল্লাহ এমনভাবে দিয়েছেন দেখা যায় একটি দেশ তেল সম্পদে সমৃদ্ধ আরেকটি দেশ সোনা খনিতে ভরপুর, কোথাও গ্যাস কোথাও অন্য খনিজ সম্পদ বিদ্যমান, কোন দেশে প্রচুর চা কোথাও পাট কোথাও তুলা কোথাও গম একেকটি দেশে একেকটির উৎপাদন বেশী হয়, কোন দেশই এমন নেই যেখানে সকল সম্পদই মওজুদ রয়েছে। প্রত্যেক মানুষ একে অপরের উপর, প্রত্যেক দেশ একেকটি আরেকটির উপর নানাভাবে নির্ভরশীল। এভাবে যদি আল্লাহ সৃষ্টি কৌশল নির্ধারণ না করতেন তা হলে পৃথিবীতে ভারসাম্য বজায় থাকতনা। আল্লাহ বিশ্বজগতের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ভূ-ভাগে পাহাড় ও বন-বনানীর পাশাপাশি জলরাশিতে ভরপুর নদনদী, খাল বিল, সাগর মহাসাগর দিয়েছেন। মানব জীবন রক্ষার জন্য পানি ও বায়ু অপরিহার্য করেছেন। শুধুমাত্র একটির উপর নির্ভরশীল মানব জীবন অকল্পনীয়। তেমনিভাবে মানব সমাজে বসবাস করতে হলে পরিবার, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র প্রভৃতির সাথে সম্পৃক্ত নানাবিধ কর্তব্য পালন করতে হয় শুধুমাত্র পরিবারের গন্ডিতে কেউ নিজের জীবন সীমাবদ্ধ রাখতে পারেনা। একজন আদর্শ মানুষ হবার জন্য পড়াশুনা করতে হয়, বন্ধু-বান্ধব প্রিয়জনের সাথে মিশতে হয়। দেশের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে হয়, আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে দায়ী ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে চলা আবশ্যক। কোন একদিকে গুরুত্ব দিয়ে আরেক দিকে অমনোযোগী থাকার সুযোগ নেই। মানব সৃষ্টি, বস্তুজগত, মানব সমাজ ও বস্তুগত সম্পদের এ ভারসাম্যতা বিনষ্ট হলেই বিপত্তি দেখা যায়। তেমনি ভাবে মানব জীবনে উন্নতি লাভ করতে হলে জীবন চলার পথে সতর্ক পদচারণা প্রয়োজন। মানুষের জীবনের সীমিত সময়ে অনেক কাজ করতে হয় এ অনেক কাজের মধ্য দিয়েই নিজের মেধা ও যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে প্রতিভা বিকশিত করতে হয়, আপন প্রতিভা বিকাশের জন্য পরিকল্পিত ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গড়তে হয়। অপরদিকে যারা ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী সমাজ বিপ্লবের শ্লোগান দেয় তারা নিজেদের সৎ, যোগ্য, দক্ষ হিসেবে তৈরী করতে না পারলে ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী সমাজ উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে কাংখিত ভূমিকা পালন অসম্ভব। তাই বলা যায় ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠনে যে উদাসীন তার পক্ষে সুন্দর সমাজ গঠন কি সম্ভব?

ইসলামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা

ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে জীবনের সকল দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। দুনিয়ার অপর কোন ধর্ম বা মতাদর্শে এমন ভারসাম্য নেই।

www.nagorikpathagar.org

কোথাও দুনিয়াকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে আর কোথাও শুধু আধ্যাত্মিক জগতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলাম দুনিয়া ও আখিরাতের উভয়বিধ কল্যাণের সমন্বয় করেছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আমাদের দোয়া শেখানো হয়েছে-" হে আল্লাহ আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর আর আখিরাতেও কল্যাণ দাও।' আল কুরআনের সূরা জুময়ার ৯-১০ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-"হে মুমিনগণ জুমার দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হও এবং বেচা কেনা বন্ধ কর, এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। এ আয়াতের পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে-

"অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।" এ আয়াত থেকে বুঝা যায় শুধু আনুষ্ঠানিক ইবাদতে মশগুল থাকতে আল্লাহ নির্দেশ দেননি বরং জমীনে বৈধ পন্থায় রুজি অন্বেষনের কথা বলা হয়েছে। এ রুটি-রুজির ব্যবস্থা হতে হবে হালাল পথে, আবার তা পুঞ্জিভূত করে রাখা যাবেনা, যা পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য। আপন উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। সূরা ফুরকানের ৬৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

"তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করেনা, কৃপণতাও করেনা এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী" কথা বার্তার ক্ষেত্রে অহেতুক নিরর্থক কথা এড়িয়ে চলা মুমীনের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে, [মুমীন তারাই] যারা নিরর্থক কথা বার্তায় নির্লিপ্ত। [সূরা মুমীনুন আয়াত-৩] এভাবে ইবাদত, অর্থ সঞ্চয়, অর্থব্যয়, ব্যবহারিক জীবন সকল ক্ষেত্রেই ইসলামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভারসাম্য রক্ষা করা। এ কারণে উম্মাতে মুহাম্মদ (সাঃ) কে বলা হয়েছে-মধ্যমপন্থী জাতি।

রাসূলের (সাঃ) জীবনই হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের সর্বোত্তম মডেল

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তিনি একদিকে আল্লাহর হক আদায় করতেন অপর দিকে বান্দার হক আদায়ের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকতেন। আপন পরিবারের সদস্যদের সাথে, প্রতিবেশীদের সাথে, ইসলামী নৈতিক চরিত্রের আলোকে সাহাবীদের প্রশিক্ষিত করার ক্ষেত্রে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, সমাজনেতা ও রাষ্ট্র নায়ক হিসেবে, বিচারপতি ও সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে "সর্বোত্তম আদর্শ" স্থাপন করেছেন। তার উম্মত হিসেবে প্রদর্শিত সকল ক্ষেত্রে তার অনুসরণ অপরিহার্য। আমরা অনেক সময় দ্বীনদারীর কথিত লেবাসে দুনিয়া থেকে দূরে থাকতে চাই। আবার অনেক সময় 'দুনিয়াদারীতে' মশগুল হয়ে দ্বীনদারী ভুলে যাই। অথচ ইবাদত-বন্দেগী সকল ক্ষেত্রেই যদি আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করা হয় তা হলে দ্বীন মুক্ত দুনিয়া যেমনি কল্পনা করা যায়না, তেমনি দুনিয়ার ঝামেলা মুক্ত পরিবেশে সত্যিকার অর্থে দ্বীনের অনুশীলন সম্ভব নয়। মূলতঃ দুনিয়ার পরিবেশে থেকেই দ্বীনের সত্যিকার অনুসরনই মুমীনের বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রে হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস প্রনিধান যোগ্য-'হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনজন সাহাবী নবী করিম (সাঃ) এর ইবাদত বন্দেগী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যে নবীর বেগমদের ঘরে উপস্থিত হলেন। তাদেরকে যখন এ সম্পর্কে অবহিত করা হলো তখন তাঁরা একে অতি অল্প

www.nagorikpathagar.org

মনে করলেন, তাঁরা বললেন আমরা কি তার মত হতে পারি, তাঁরতো পূর্বের এবং পরের সকল কিছুই মাফ করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের একজন বললেন, "আমি সারা রাত নামাযের মধ্যে কাটাব, অন্য জন বলল, আমি সারাজীবন রোজা রখব, রোজা ভংগ করবনা–তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমি স্ত্রীর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকব কখনো বিবাহ করবনা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এসব শুনে তথায় পদার্পণ করলেন এবং বললেন তোমরা কি এমন কথা বলছ? আল্লাহর শপথ আমি কি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক আল্লাহভীরু নই? আমি কি আল্লাহর নাফরমানীকে তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভয় করে চলি না? কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখ, আমি রোজা রাখি, আবার ভাঙ্গি, আমি নামাযও পড়ি–আবার ঘুমাই, বিশ্রামও করি, স্ত্রীদের (স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করার পরিবর্তে) বিবাহও করি। আর ইহাই হচ্ছে "আমার নীতি-আমার আদর্শ। কাজেই যে আমার নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করবেনা আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। [বুখারী-মুসলীম]।

মূলত এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, মানব জীবনের স্বভাব সম্মত সকল চাহিদা ও দাবী পূরণে ভারসাম্য রক্ষাই হচ্ছে দ্বীনদারীর বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন– হযরত রাসূলে করিম (সাঃ) বললেন, হে আব্দুল্লাহ তুমি যে দিনভর রোযা থাক ও রাত ভর ইবাদতে অতিবাহিত করে দাও সে খবর আমি পাইনি মনে করেছ? তখন আমি বললাম হ্যাঁ হে রাসূল! আপনি যা শুনেছেন তা সত্য। তখন তিনি বললেন, না তুমি এরূপ করোনা। তুমি রোযা রাখবে, মাঝে মধ্যে রাখবেনা। রাত্রিকালে তুমি ইবাদত করবে বটে, কিন্তু ঘুমাবেও অবশ্যই। কেননা তোমার উপর তোমার দেহের সুনির্দিষ্ট হক রয়েছে, তোমার চক্ষুর হক রয়েছে এবং তোমার জীবন সঙ্গিনীরও হক রয়েছে [আর এসব হক অবশ্যই পালনীয়] বুখারী।

এ হাদীস থেকে বুঝা যা, মানুষকে যেমনিভাবে আল্লাহর হক আদায় করতে হয়, তেমনিভাবে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী নিজের হকও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের হকও আদায় করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে ভারসাম্য বিনষ্ট করা নবী (সঃ) এর শিক্ষার বিপরীত।

ভারসাম্য জীবন কেন প্রয়োজন

ভারসাম্য জীবন মানে আত্মগঠন, কর্মী গঠন, সাংগঠনিক কাজ, ছাত্রত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন প্রভৃতির মধ্যে সমতা রক্ষা করে নিজেদের প্রতিভা বিকশিত করার নিরলস প্রচেষ্টা, মানব জীবনে যতসব প্রয়োজন রয়েছে সকল প্রয়োজন পূরণে সদা সচেষ্ট থাকা, কোন একটির দিকে অত্যাধিক ঝুঁকে অন্যদিক ক্ষতিগ্রস্থ না করা। আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইন্টারনেট ও কম্পিউটারের যুগে বিশ্বনেতৃত্ব দিতে হলে সৎ যোগ্য ও দক্ষ কর্মীবাহিনী প্রয়োজন, সততা নৈতিকতা বিহীন বৈষয়িক যোগ্যতা, প্রশাসনিক দক্ষতা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপযোগী হতে পারে কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে তার কোন গুরুত্ব নেই। আবার যোগ্যতা ও দক্ষতা বিহীন সততা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে শ্রদ্ধার বিষয় হতে পারে তাদের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়। তাঁরা ইসলামী রাষ্ট্রের উত্তম নাগরিক হতে পারবেন কিন্তু উত্তম

www.nagorikpathagar.org

শাসক বা পরিচালক হতে পারবেন না। মূলতঃ রাসূলের আন্দোলনে প্রথম পর্যায়ে যাঁরা শামিল হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আবু বকরের মত প্রজ্ঞাবান, ওমরের মত প্রজাবৎসল শাসক, ওসমানের মত দানশীল বিত্তবান, আলীর মত জ্ঞানী ব্যক্তিরা সামনের কাতারে ছিলেন। বর্তমান যুগে সফল ইসলামী বিপ্লবের জন্য জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, কুটনৈতিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, সমাজসেবক, প্রশাসক সবই প্রয়োজন। এ সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার মত অবস্থা সৃষ্টি না হলে নিছক রুটিন কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে সমাজ বিপ্লব আশা করা যায় না। সফল ইসলামী বিপ্লবের জন্য গণমুখী চরিত্র সম্পন্ন নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পন্ন প্রশাসক প্রয়োজন। আমাদের মাঝে অনেককে আত্মগঠনে উদাসীন থেকে ত্যাগের মানসিকতা পোষণ করতে দেখা যায়, আবার কেউ আত্মগঠনের নামে আত্মপ্রতিষ্ঠায় এমন বিভোর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় তারা অগ্রসর হতে চাননা। অনেকে মনে করেন আত্মগঠন ও মানউন্নয়ন এক সাথে সম্ভব নয়। মূলতঃ এ সবই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়। আমাদেরকে প্রান্তিকতা পরিহার করে এক সাথে ভাল মুসলীম ও ভাল ছাত্র হতে হতে হবে, দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ সাধনের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের লক্ষ্যে সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করতে হবে। আর যারা প্রতিভা বিকশিত করে দ্বীনের প্রয়োজনে, দ্বীনই যাদের জীবনোদ্দেশ্য, দ্বীনের প্রয়োজনে তারা সব কিছু ত্যাগে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু জীবনই যদি উত্তম ভাবে গড়া না হয় তা হলে কিভাবে উত্তম কিছু ত্যাগ করা সম্ভব হবে?

যে সকল ক্ষেত্রে আমাদের সময় দিতে হয়

আমরা মুসলীম হিসেবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায়, আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে, ছাত্র হিসেবে, পরিবার, সমাজ, সংগঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রে নানা কাজে সময় দিতে হয়ঃ

(ক) আদর্শ মুসলীম হিসেবেঃ আমরা আল্লাহর খলীফা, আল্লাহর গোলাম, উম্মাতে মুহাম্মদ (সঃ) উম্মাতে ওয়াসাত হিসেবে নামায, রোজাসহ মৌলিক ইবাদতসমূহ যথাযথ পালন, কুরআন, হাদীস সরাসরি অধ্যয়ন, তাহাজ্জুদসহ নফল ইবাদত সমূহ পালন, ইসলামের যথাযথ ব্যাপক ইলম অর্জন, ইলম অনুযায়ী বাস্তব জীবনে আমল, তাকওয়ামন্ডিত জীবন, আল্লাহর পথে অর্থব্যয়, জিহাদ ফি সবিলিল্লাহর কাজে অনেক সময় দিতে হয়।

(খ) আদর্শ ছাত্র হিসেবেঃ ভাল ছাত্র আর ভাল রেজাল্ট হলেই আদর্শ ছাত্র হওয়া যায় না, আদর্শ ছাত্র হওয়ার জন্য নিয়মিত ক্লাসে যোগদান, নিয়মিত পড়াশুনা, ক্লাশে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে গমন, শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ, শিক্ষকদের শ্রদ্ধা, সহপাঠীদের সহযোগিতা, পরীক্ষার সর্বোত্তম প্রস্তুতি গ্রহণের পাশাপাশি আত্মিক ও মানসিক উৎকর্ষতা সাধন, চারিত্রিক শ্রেষ্টত্ব অর্জন ও শারীরিক যোগ্যতা বিকাশে যত্নশীল থাকতে হয়।

(গ) পারিবারিক প্রয়োজনঃ পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে পিতামাতার খিদমত, ভাই-বোনদের খোঁজখবর নেয়া, পারিবারিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন, পারিবারিক উন্নতি সাধন, আত্মীয় স্বজনের সুখ দুঃখে অংশ গ্রহণ করতে হয়।

(ঘ) আদর্শ নাগরিক হিসেবেঃ সামাজিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন, পীড়িতদের দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, বিবাহ-শাদীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে

www.nagorikpathagar.org

অংশ নেয়া, রাস্তা-ঘাট, পুল সেতু সহ সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা, ক্লাব, সংস্থাসহ সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে চক্রান্ত প্রতিরোধে ভুমিকা পালন, দেশ থেকে অন্যায় অবিচার দূর করার চেষ্টা, নির্বাচনসহ নাগরিক অধিকার আদায় ও কর্তব্য পালন করতে হয়।

(ঙ) আদর্শ সংগঠন বা কর্মী হিসেবে ঃ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অপরিহার্য দাবী পূরণে সংগঠনের দাওয়াতী কাজ সম্প্রসারণ, সাংগঠনিক মজবুতি অর্জনের লক্ষ্যে সঠিক মানে কর্মী গঠন, সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ, আর্থিক স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন, প্রশাসন, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবীসহ বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ, রেকর্ড ও আমানত সংরক্ষণ, বৈঠকাদিতে অংশ গ্রহণ বা পরিচালনা, গণভিত্তি রচনার চেষ্টা, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক যোগাযোগ সহ নানামুখী কাঝে সময় দিতে হয়।

(চ) টেকনিক্যাল জ্ঞান অর্জন ও ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে ঃ প্রত্যেককে আপন জীবনের নির্দিষ্ট টার্গেট [ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আলেম, আইনজীবী, সাংবাদিক, গবেষক প্রভৃতি] অর্জনের চেষ্টার পাশাপাশি টেকনিক্যাল জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতে হয়, যেমন ড্রাইভিং, টাইপ রাইটিং, শর্টহ্যান্ড, কম্পিউটার প্রভৃতি শিখতে অতিরিক্ত সময় দিতে হয়। বাংলা ভাষা চর্চার পাশাপাশি ইংরেজী ও আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যাকরণ, শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পড়াশুনার বাইরে অতিরিক্ত পড়তে হয়। পত্র পত্রিকা পাঠসহ দেশ বিদেশের সমকালীন ঘটনা প্রবাহ জানতে হয়। সাধারণ জ্ঞানে অসাধারণ যোগ্যতর অধিকারী হতে হয়।

এভাবে আমাদেরকে নানামুখী কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হয়। একটির প্রতি অধিক ঝুঁকে অপরটি ক্ষতিগ্রস্ত করলে শুধু একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনেই ক্ষতি সীমাবদ্ধ থাকেনা, এ কারণে পরিবার, সমাজ, সংগঠন ও রাষ্ট্রের প্রভুত ক্ষতি হয়। এজন্য এ সকল কাজে ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন। বাহ্য দৃষ্টিতে অনেক কাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা অসম্ভব মনে হয়, এ অসম্ভব বিষয়টি একেবারেই সম্ভব, যদি পরিকল্পিত জীবন যাপন করা হয়।

ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের জন্য যা প্রয়োজন

ভারসাম্য জীবন গঠনের ধারণা অবাস্তব তত্ত্ব কথা নয়। আমরা যদি আমাদের জীবনকে পরিকল্পিতভাবে গঠন করি তাহলে অনেক কিছুই সম্ভব। আজকের মালয়েশিয়া পরিকল্পিত উদ্যোগ, কর্মস্পৃহা, পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়নের পদক্ষেপের মাধ্যমে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশের চেয়েও আগামী ২০২০ সালের মধ্যে এগিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ। অপর দিকে সৌদী আরব প্রচুর অর্থ সম্পদের অধিকারী হলেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিম বিশ্বের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। অথচ বাদশাহ ফয়সল তাঁর পরিকল্পিত পদক্ষেপে সৌদী আরবকে এ পর্যায়ে এনেছিলেন। পরিকল্পিতভাবে জীবন গঠনে দৃঢ়তা থাকলে জীবনকে উত্তম ভাবে গড়া সম্ভব। হযরত ইমাম আবু হানিফা, ইমাম বুখারী (রাঃ) সহ মুসলীম মনীষীদের জীবন কথা এ সত্যেরই বাস্তব দৃষ্টান্ত। পরিকল্পিত জীবন যাপনের মাধ্যমে ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে মৌলিক ভাবে প্রয়োজনঃ

(১) সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহারঃ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। আল্লাহর

www.nagorikpathagar.org

রাসুল (সাঃ) যে ৫টি জিনিসকে গণীমত হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'সময়ের সচেতনতা' তার মাঝে অন্যতম। মানুষের জীবন সীমিত, এ সীমিত সময়ে অনেক কাজ করতে হবে তাই সময় ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে টাকা হারালে পাওয়া যায় কিন্তু সময় হারালে পাওয়া যায়না। এ কারণেই বলা হয় Time and tide waits for none সময় স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না। সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হলে কয়েকটি বিষয়ে যত্নশীল থাকতে হবে।

(ক) প্রত্যহ যে কাজ করবেন তার আলোকে সময় জরিপ করুন।

(খ) দৈনন্দিন কাজের আলোকে সময় সূচী তৈরী করুন। বিশেষ প্রেক্ষিতে সময় সূচীর বাইরে অপ্রত্যাশিত কিছু জরুরী কাজ আসতে পারে। সে দিকেও নজর রাখতে হবে।

(গ) সময়মত যে কাজ করতে পারেননি তার জন্য অবসর সময় কাজে লাগান।

(ঘ) সময়কে দ্বিগুণ কাজে লাগান, মনে করুন আপনি একটি বৈঠকে আছেন মাঝে বিরতি হল, বন্ধু বা সহকর্মীর বা কারো নিকট সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখে ফেলুন অথবা অন্য একটি কাজ সেরে নিন।

(ঙ) সময় বাঁচানোর জন্য আধুনিক প্রযুক্তি টেলিফোন, টেলিগ্রাম ব্যবহার করুন। টেলিফোনে খোঁজ নিয়ে কারো সাথে যোগাযোগ বা অন্য কোথাও গেলে সময় অপচয় হয়না।

(চ) কাজের প্রতিবন্ধকতা দূর করুন, গাড়ীর শব্দ, ঝনঝনানিতে পড়া বা যেসব কারণে নির্দিষ্ট কাজে বার বার মনোযোগ ব্যাহত হচ্ছে ত দূর করে কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

(ছ) বক্তব্য সংক্ষেপ করুন কারো সাথে কথা বার্তা, কোথাও বক্তব্য উপস্থাপন সংক্ষেপে করুন, অনেক সময় একজনের সাথে অহেতুক আলাপে প্রচুর সময় নষ্ট হয়।

(জ) গাল-গল্প, আড্ডা, অহেতুক ঘুরে বেড়ানো বন্ধ করতে হবে।

(২) অধ্যবসায় ও পরিশ্রম প্রিয়তাঃ রাত দিন পরিশ্রমের মানসিকতা থাকতে হবে 'আজ ক্লান্ত কাল করব' এ মানসিকতা দূর করতে হবে। অবশ্যি অধিক ক্লান্তিতে বিশ্রাম নিতে হবে। তবে শরীর যখন ভাল থাকে তখন অধিক পরিশ্রম করতে হবে। তাহলেই জীবন গঠন সম্ভব। একারণেই বলা হয় Industry is the mother of good luck. পরিশ্রম সৌভাগ্যের জননী, আর Idleness is the root of all evils অলসতা সকল দোষের মূল।

(৩) স্বাস্থ্য সংরক্ষণে যত্নশীল ভূমিকাঃ অনেকে হঠাৎ অধিক সাংগঠনিক কাজ বা পড়াশুনার দিকে নজর দিতে গিয়ে স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখেনা। ফলে দেখা যায় এক ঘন্টা অধিক কাজের ফলে একমাস কাজ করা থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। কিংবা ২০ টাকা বাঁচাতে গিয়ে বিশ হাজার টাকা খরচ করতে হয় তাই প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় খাবার গ্রহণ, ধীরে চিবিয়ে খাওয়া, বাসী পঁচা না খাওয়া, পরিমিত ঘুম, ফজরের পর ঘুমোনোর অভ্যাস ত্যাগ, পোষাক পরিচ্ছেদে পরিচ্ছন্নতা, নিয়মিত ব্যায়াম, অসুখ হলেই রোগ লালন না করে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.org

(৪) সাংগঠনিক কাজ ঃ কি করা হবে আগে থেকেই চিন্তাকরা, একসাথে অনেক অনেক কাজ সম্পন্ন করা, সময় ভাগ করে ছোট ছোট Plan করা, জরুরী কারণ ছাড়া Change না করা, বেশী কাজ করে কম Rssult প্রাপ্তির চেয়ে অল্প কাজে অধিক ফল লাভ, সাংগঠনিক কাজে বিতর্ক এড়িয়ে চলা দরকার, আবেগ নিয়ন্ত্রন, উত্তেজনাকর বক্তব্য, শ্লোগান দান থেকে নিবৃত্ত থাকা প্রয়োজন। মেজাজের ভারসাম্যহীনতা, দ্রুত ফললাভের মনোভাব, অপরিপক্ক চিন্তা, আবেগ তাড়িত পরিকল্পনা সাংগঠনিক কাজে লাভের চেয়ে ক্ষতিই সাধন করে।

(৫) উদ্বেগ, হতাশা ও দুশ্চিন্তামুক্ত থাকাঃ অনেক সময় অল্প সমস্যাতে অনেকে ভেঙ্গে পড়েন, হাতাশ হয়ে যান, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হন, এসব কিছু মুক্ত হতে হবে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক কোন সমস্যা বা বিপর্যয়ে হতাশ হওয়া যাবেনা। আনন্দঘন পরিবেশে একাগ্রচিত্তে অল্প সময়ে যে কাজ করা যায়, নানা চিন্তা মগ্ন থেকে অধিক সময় ধরে তা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়না।

(৬) পড়াশুনা উত্তমভাবে করাঃ উত্তম পড়াশুনার জন্য উত্তম পরিবেশ প্রয়োজন। উত্তম পরিবেশে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। মনোযোগ বিদ্যুতের মত, বিদ্যুৎ থাকলে যেমনি সুইচ টিপ দিলে বাতি জ্বলবে তেমনি মনোযোগ থাকলে পড়াশুনা অনুধাবন করা সম্ভব হবে। অন্য চিন্তা এলে কাগজে লিখে ফেলা বা নামায পড়ে চিন্তামুক্ত হওয়া প্রয়োজন। উত্তম পড়া শুনার জন্য উত্তম পাঠ পদ্ধতি অনুশীলন করতে হবে, এ জন্য প্রয়োজন (ক) বছরের শুরু থেকেই সিলেবাস ভিত্তিক নিয়মিত অধ্যয়ন, (খ) সুযোগ পেলেই অধ্যয়নের মানসিকতা পোষন (গ) তোতা পাখির মত মুখস্থ না করে ভালভাবে অনুধাবন (ঘ) পরীক্ষার্থীদের সাজেশান মাফিক পড়া (ঙ) মুখস্থের পর লেখা, ভুল হলে বই দেখে সংশোধন (চ) জটিল বিষয়ে শিক্ষক বা ভাল ছাত্রদের সহযোগিতা নিয়ে পরিস্কার Concept হওয়া দরকার। অপর দিকে গবেষণায় দেখা গেছে, আমরা নতুন যা কিছুলিখি প্রথমদিনই তার বেশীর ভাগ স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়। এজন্য ১২ ঘন্টার পূর্বেই চলাফেরা অবসরে অহেতুক গল্প না করে রোমন্থন করা প্রয়োজন। অনেক সময় আমরা ক্লাসে উপস্থিত থাকার সুযোগ থাকার পরও 'একটু বাইরে ঘুরে বেড়াই' এ মানসসিকতা রাখি তা ঠিক নয়। ক্লাশে স্যার যা পড়াবেন তা পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে দেখে গেলে বুঝতে সহজ হয়। অনেকে ছাত্র হিসেবে ভাল, পড়াশুনাও বেশ করেন, কিন্তু কাংখিত ফলাফল করতে পারেননা। পরীক্ষার উত্তম ফলাফলের প্রতি সকলের যত্নশীল থাকা আবশ্যক। কাউকে কাউকে বলতে শুনা যায় পড়লেও 2nd Class না পড়লেও 2nd Class তাই পরীক্ষার আগের রাতেও গল্প-গুজব করিয়ে সময় কাটান। অথচ ভাল ভাবে চেষ্টা করলে ভাল রেজাল্ট করতে পারেন এ বিশ্বাস ও আস্থা তার নেই। আবার কেউ সারা বছর পড়েন না। পরীক্ষার রাত জাগ্রত থেকে পড়াশুনা করে পরীক্ষার হলে মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হন। এজন্য সেশনের শুরু থেকে পড়াশুনা করা দরকার। ভাল Result এর জন্য বছরের শুরু থেকেই Selected পড়াশুনার বাহিরে Common পড়াশুনা পুরো সিলেবাস অনুযায়ী থাকা ভাল। আর পরীক্ষার হলে আবশ্যিক প্রশ্ন আছে কিনা তা দেখে পর্যায়ক্রমে ভাল প্রস্তুতি অনুযায়ী উত্তর পত্র লেখার দিকে খেয়াল রাখা

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োজন। অনেকে একবার পরীক্ষা খারাপ হলে ভেংগে পড়েন মনে রাখা দরকার বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন দুবার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন।

সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করুন পরিকল্পিত জীবন গড়ুন

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রতিভা লুকায়িত রয়েছে। এ প্রতিভা বিকশিত করতে পরিকল্পিত জীবন গঠন আবশ্যক, তাই দরকার:

[১] জীবনের টার্গেট নির্ধারণ : প্রত্যেক ব্যক্তির মেধা, যোগ্যতা, ঝোঁক প্রবণতা এক ধরনের নয়। একজন ভাল গায়ক হতে পারে, ভাল গবেষক বা সমাজ সেবক হতে পারেনা। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে বিশেষ যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকে আপন মেধার আলোকেই ঠিক করতে হবে, [ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক, প্রশাসক ইত্যাদি] কি হতে চান। ১,২,৩ এভাবে পর্যায়ক্রমে জীবনের টার্গেট নির্ধারণ করুন।

[২] প্রবল ইচ্ছাশক্তি : জীবন গড়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তি সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। প্রবল ইচ্ছাশক্তি অপরাজেয় বীরের মত। যার ইচ্ছাশক্তি দূর্বল তার পক্ষে বড় কিছু করা সম্ভব নয়। প্রবল ইচ্ছা শক্তি ও তদানুযায়ী চেষ্টার ফলেই পৃথিবীতে অনেকে বরেণ্য হয়েছেন। হিটলার ঠিলাগাড়ীর চালক ছিলেন, ষ্টালিন জুতোর মুচি ছিলেন, মুসোলিনি মুদির দোকানে কাজ করতেন, পরবর্তীতে তারা সকলে নিজ নিজ দেশের কর্তা হয়েছিলেন। এটা জীবন গড়ার ক্ষেত্রে তাদের তীব্র ইচ্ছার ফসল।

[৩] চিন্তাশক্তির বিকাশ ও আত্মোপলব্ধি ঃ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহ অনেক শক্তি ও যোগ্যতা দিয়েছেন কিন্তু বেশীরভাগই নিজের প্রতিভা সম্পর্কে সচেতন নয়। আমরা শক্তি ও যোগ্যতা বলতে শুধু দৈহিক শক্তিকে বুঝি, কিন্তু দৈহিক শক্তি সাময়িক, তার পাশাপাশি প্রত্যেকের মাঝে উহ্য শক্তি আছে তা হচ্ছে চিন্তা শক্তি। এটা চোখে দেখা যায় না। মেধা বুদ্ধি, জ্ঞান এগুলো প্রয়োগ করেই চিন্তা শক্তির বিকাশ করতে হয়। ইমাম বুখারীর হাদীস শাস্ত্রে অবদান, নিউটনের মধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিস্কারের ফলে তাদের প্রতিভার সাক্ষর দেখতে পাই। আমরা যখন দেখি একটি গাড়ীকে পিছনে ফেলে আরেকটি গাড়ী সামনে চলে যায় আমরা ভাবি ঐ গাড়ীর ইঞ্জিন অধিক শক্তিশালী। তেমনি একজন মানুষ যখন আরেকজনকে ডিঙ্গিয়ে উপরে উঠে যায় তখন আমরা বলি 'অমুক অধিক মেধাবী বা প্রতিভার অধিকারী'। হয়ত বা যে ব্যক্তিটি মেধার স্বাক্ষর রাখতে পারেননি তার মধ্যে কি প্রতিভা লুকায়িত আছে সে অনুভবও করেনি। তাই এ বাস্তব সত্য উপলব্দি করতে হবে 'যে নিজেকে চিনতে পেরেছে সে নিজের মহাপ্রভুকে চিনল।' একারণেই সক্রেটিস শিষ্যদের বলতেন Know thy self নিজেকে জানো, বস্তুত প্রত্যেকের মাঝে যে প্রতিভা লুকায়িত রয়েছে তা উপলব্ধি করতে হবে এবং কাজে লাগাতে হবে।

[৪] সবাই সুপ্ত প্রতিভার অধিকারী, বিকাশের দায়িত্ব নিজের : প্রত্যেকের মধ্যে মেধা লুকায়িত আছে তবে সকলের সৃজন ক্ষমতা সমান নয়। প্রত্যেকের মাঝে যে প্রতিভা লুকায়িত রয়েছে তা কাজে লাগালেই তিনি প্রতিভাধর হিসেবে যশস্বী হতে পারেন। প্রত্যেকের মাঝে যে রত্নতুল্য প্রতিভা রয়েছে তা হচ্ছে **(i)** চিন্তাশক্তি [Thinking power] **(ii)** ইচ্ছা শক্তি [Will power] **(iii)** মনন শক্তি [Power of your sool] **(iv)** কর্মশক্তি [Physical strength or work-

www.nagorikpathagar.org

ing capacity] আমাদের এসব সম্পদ মূলত লুকায়িত আছে [ক] মস্তিস্কে [In the brain] [খ] মন [In the mind] [গ] আত্মায় [In the soul] [ঘ] দেহে [In the body] প্রত্যেকের সুপ্ত প্রতিভা নিজেকেই বিকশিত করতে হবে। কোন জিনিস দেখে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন, উলিল আলবাব বা বুদ্ধিজীবী তারাই 'যারা আসমান ও যমীনের নানা সৃষ্টি নৈপুণ্য নিয়ে ভাবে গবেষণা করে।' একজন বিজ্ঞানীর উপর হতে নীচে কিছু পড়তে দেখা আর একজন সাধারণের দেখা এক নয়। একজন কবির গাছ গাছালী, নদনদীর দৃশ্য দেখা আর একজন সাধারণের দেখা এক নয়। আমরা বাহ্য দৃষ্টিতে যা কিছু দেখি গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিগূঢ়তত্ত্ব অনুধাবন করতে হবে। আমাদের প্রতিভা বিকশিত করতে হলে যে কোন কাজের প্রতি একাগ্রতার বিকল্প নেই। অনুসন্ধানী দৃষ্টি, অবিরল সাধনা একজন ব্যক্তির প্রতিভা বিকাশে সহায়ক। অপরদিকে উদ্যোগের অভাব, প্রতিকূল সামাজিক চাপ, হীনমন্যতাবোধ, পরশ্রীকাতরতা, অনুদান চিত্ত অনেক প্রতিভা বিনষ্ট করে।

[৫] সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী : প্রত্যেক ব্যক্তিকে জীবন গঠনের জন্য সঠিক দৃষ্টি ভঙ্গী গ্রহন করতে হবে। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে অনেকের জীবন গতিহীন হয়ে পড়ে। যেমন একখন্ড লৌহ দ্বারা কি তৈরী করবেন বটী, কোদাল, কুড়াল ইত্যাদি তা ঠিক না করে ফেলে রাখলে কোন কাজে আসেনা। তেমনি জীবন গঠন কেন্দ্রীক অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিবর্তে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ প্রয়োজন।

[৬] অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করুন, কর্মক্ষমতা কাজে লাগান: যার যতটুকু ক্ষমতা আছে তা কাজে লাগানের জন্য অহেতুক দ্বিধা সংশয়ে সময় অপচয় না করে কাজ শুরু করে দেয়া ভাল। অতীতে যারা এ কাজে আত্মনিয়োগ করে ছিলেন তাদের মাঝে যাঁরা সফল হয়েছেন তাদেরকে মডেল হিসেবে সামনে রেখে সময়ের মূল্য দিতে হবে। কাজে এক গোঁয়েমী আসলে দূর করতে হবে, বিক্ষিপ্ত চিন্তা বাদ দিয়ে যা হতে চান তার পিছনে সময় দিতে হবে।

[৭] উচ্চাশা : উচ্চাশার কারণে অনেকেই পৃথিবীতে সুনাম সুখ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। এ কারণেই বলা হয় Ambition makes people diligent, যদি ভাবা হয় মুহাম্মদ বিন কাশেম কিভাবে ১৭ বছর বয়সে সিন্ধু বিজয় করলেন, ড: মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ২৪টি ভাষার উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন, কবি নজরুল কিভাবে এত কবিতা লিখেছেন, এ সকল দৃষ্টান্ত সামনে রেখে জীবন গঠনে উচ্চাশা পোষণ করা দরকার।

[৮] আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা : হযরত মুসা (আ:) দোয়া করতেন- 'হে আল্লাহ আমার বক্ষ সম্প্রসারিত কর, আমার কাজ সহজ করে দাও।' হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ আমার পরিজনদের মুত্তকীনদের অগ্রগামী বানিয়ে দাও।' এভাবে রাসূল (সাঃ) ও আল্লাহ কাছে দোয়া করতেন। আমাদেরকে আল্লাহর কাছে ধর্না দিতে হবে, আমাদের প্রতিভা বিকাশের জন্য। তাই আমরা প্রায়ই দোয়া করি 'হে আল্লাহ্ আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।' আল্লাহর রাসূলের দোয়ার বদৌলতই হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) তারজুমানুল কুরআন বা কুরআনের ভাষ্যকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

[৯] প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র বিস্তৃত যে কোনটি বেছে নিন: পৃথিবীতে প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র অনেক, পেলে, ম্যারাডোনা ফুটবল খেলেই বিশ্ব বিখ্যাত, ইমরান খান

www.nagorikpathagar.org

ক্রিকেটের জন্য এত খ্যাতি অর্জন করেছেন। কেউ সাংবাদিতায় কেউ বক্তৃতায় একেক জন একেক ভাবে নিজের প্রতিভা বিকশিত করেছেন। আপনি যদি সাংবাদিকতার মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত করতে চান নিয়মিত লিখতে হবে। কোন ঘটনা Report করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে Who কে ঘটনা ঘটান, Where কোথায়, When কখন What কি জন্য ঘটান Why কেন ঘটান এবং How কেমন করে ঘটান।

আর যদি আপনি সুবক্তা হতে চান, তা হলে কোন সমাবেশ বক্তব্য দেয়ার পূর্বে বক্তব্যের লক্ষ্যস্থির করুন, নি:সংকোচে পছন্দ মত বিষয়বস্তু নির্বাচন করে শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে বক্তব্য দিন। শ্রোতাদের বিশ্বাস জন্মাতে হবে আপনি যা বলছেন জরুরী। বক্তব্য সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ হওয়া দরকার। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সংক্ষিপ্ত নসীহত পছন্দ করতেন। বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য বক্তব্যের মাঝে পরিচিত কোন ঘটনা বা উদাহরণ উল্লেখ করুন এবং তথ্য তুলে ধরুন। বক্তব্য সংক্ষেপ করে চিত্রধর্মী আবেদনময়ী হওয়া দরকার। কঠিন ভাষা প্রয়োগের পরিবর্তে সহজ পরিচিত যথাযথ ভাষা প্রয়োগ করুন শ্রোতাদের সাথে বক্তব্য বিনিয়য় করুন, শ্রোতাদের আপনার কথার অংশীদর করুন, । নিজেকে সব জান্তা না ভেবে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষনের চেষ্টা করুন। দর্শক শ্রোতাদের হাত উছিয়ে আপনার বক্তব্যের সমর্থন আদায় করুন।

সাংবাদিকতা, বক্তৃতা চর্চা,লেখালেখিসহ প্রতিভা বিকাশের বহুবিধ ক্ষেত্র থেকে নিজের জন্য সর্বাধিক উপযোগী ক্ষেত্র বেছে নেয়া সহজ নয়। কবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত বাংলার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষায় কাব্য চর্চা করে প্রতিষ্ঠিত হতে না পেরে আক্ষেপ করে লিখেছিলেব, হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ রতনতা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি– । অনেকে কোন ক্ষেত্রে ভাল করবেন তা নির্ণয় করতে পারেননা। তাই জীবন উত্তমভাবে বিকশিত হয়না।

আমাদেরকে প্রতিভা বিকাশের সাথে সাথে ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতি নজর রাখতে হবে। অনেক প্রতিভাধর ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের অভাবেই প্রতিভা মূল্যায়িত হয়না। প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের চেষ্টার পাশাপাশি একজন মানুষের জীবন সুন্দরভাবে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন মৌলিক মানবীয় গুণাবলী অর্জন। প্রবল আত্মবিশ্বাস, সিরিয়াসনেস, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, পরিশ্রমপ্রিয়তা, দয়া, দানশীলত, উদারতা, বিশ্বস্ততা, সচেতনতা, দুরদৃষ্টি, তীক্ষ্নবুদ্ধি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, অমায়িক ব্যবহার, সংযম, বিপদে দৃঢ়তা, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, সুন্দর মাধুরীময় জীবন, হাসিমুখে বচন, উত্তম জীবন গঠনের পরিপূরক শক্তি।

— o —

www.nagorikpathagar.org

www.pathagar.com

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুজাহিদ

www.pathagar.com